সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র ● চতুর্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ● জুলাই-আগস্ট ২০১৮ ● পাঁচ টাকা

এই সময়ে প্রতিবাদ ছাড়া মর্যাদা নিয়ে বাঁচার কথা ভাবা যায় না

দেশের আকাশে-বাতাসে এখন কান্না-বেদনা-আর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার সাথে মিশে আছে ক্ষোভ-বিদ্রোহ। মানুষ এখন আর বাধ্য হয়ে সবকিছু মেনে নিচ্ছে না। রাস্তায় নামছে, প্রতিবাদ করছে। সেই প্রতিবাদের উপর নেমে আসছে নির্মম আক্রমণ। ব্যাপারটা এখন আর কোন রাখঢাক নিয়ে নেই। রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং সরকারি দলের অন্যান্য সংগঠনের ক্যাডাররা, সর্বোপরি সবগুলো প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন – সম্মিলিতভাবে সবরকম বিরোধী মত ও তাকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ-বিক্ষোভকে নির্মমভাবে দমন করছেন। এর মাত্রা, গভীরতা ও ব্যাপকতা অতীতের স্বৈরশাসনের নির্মম নির্যাতনের অভিজ্ঞতাকেও হার মানিয়েছে। সংক্ষেপে তার কিছু রূপের দিকে আমরা আলোকপাত করতে পারি।

১. রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অর্থাৎ পুলিশ, র‍্যাব ইত্যাদি দিয়ে যে কাউকে যে কোন সময় তুলে নেয়া, তারপর গ্রেফতার অস্বীকার করা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। একে বলা হয় গুম। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদন অনুসারে গত বছর (২০১৭ সালে) সারাদেশে গুমের ঘটনা ঘটেছে ৮০টি। 'অধিকার' এর প্রতিবেদন – গত বছর ক্রসফায়ারের ঘটনা ঘটেছে

কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের ওপর ছাত্রলীগের হামলা

১৩৯টি। মাদকবিরোধী অভিযানের নামে গত দুই মাসে 'ক্রসফায়ার' নাম দিয়ে হত্যা করা হয়েছে দেড়শ জনেরও উপরে। ক্রসফায়ারের সবগুলো ঘটনায় একই প্রেসনোট প্রকাশ করা হয়। অনেক মিডিয়া ও সংবাদপত্রে এর নাম দেয়া হয়েছে 'স্ট্রেইট ফায়ার'। অর্থাৎ কোন 'ক্রস'ই সেখানে হয় না। দু'পক্ষের গোলাগুলির মধ্যে পড়ে মারা গেছে এ খবর নিছক বানোয়াট। সম্প্রতি মাদকবিরোধী অভিযানের সময় টেকনাফের একরামুলকে হত্যা করার সময় তার স্ত্রী-কন্যার সাথে ফোনকলের রেকর্ডটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। 'ক্রসফায়ার' এর বীভৎসতা, এর সাজানো নাটক এই ঘটনার মতো আর কোন ঘটনাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে পারেনি।

২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ বীভৎস রূপ ও চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর আগে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে করে একজন আন্দোলনকারীর (যে কোন সংগঠনের সাথে যুক্ত নয়) পায়ের হাড় ভেঙ্গে দেয়ার মতো ঘটনা ঘটেনি। খোলামেলাভাবে শিক্ষকদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে, তাদেরকে আঙ্গুল তুলে শাসানো হচ্ছে, শিক্ষিকাদেরকে শুনিয়ে তাদের নামে অশ্লীল উক্তি করা হচ্ছে। কোটা সংস্কার আন্দোলনে সরব থাকায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের হুমকি দেয়া হয়েছে। 'চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সাইন্সেস ইউনিভার্সিটি' এর ছাত্র মীর মোহাম্মদ জুনায়েদকে বহিস্কার করা হয়েছে কোটা আন্দোলন নিয়ে ফেসবুকে লেখালেখি করায়। মানুষ আইয়ুব-এরশাদের সময়ও যা দেখেনি, তা এখন দেখছে।

৩. পুলিশ আহতদের কোন অভিযোগ নথিভুক্ত করছে না। উপরন্তু ধরে নিয়ে যাচ্ছে আন্দোলনকারীদের। কোটা আন্দোলনকারীদের উপর কী নির্মম হামলা করেছে ছাত্রলীগ। এর ভিডিও রেকর্ডিং সারাদেশ দেখেছে। অথচ হামলাকারীদের গ্রেফতারের কোন উদ্যোগ না নিয়ে গ্রেফতার করা হল আন্দোলনকারীদের। শুধু গ্রেফতার নয়, তাদের রিমান্ডে পর্যন্ত নেয়া হল। গাইবান্ধায় ছাত্র ফ্রন্ট নেতাকর্মীদের উপর কলেজ ও শহর মিলে দু'দফা প্রকাশ্য হামলা চালানো হল, অথচ পুলিশ কোন মামলা নিতে রাজি হল না। কোটা আন্দোলনকারীদের নেতা রাশেদকে রিমান্ডে নিয়ে যাওয়া হল, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে প্রধানমন্ত্রীর নামে কটূক্তি করেছে। প্রধানমন্ত্রী কোন ধর্মগুরু বা মহামানব নন। এদেশে হরহামেশাই রবীন্দ্র-নজরুল, বৃটিশবিরোধী *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

এবারের জাতীয় বাজেটের কয়েকটি দিক

কৌশলে জনগণের ঘাড়ে করের বোঝা চাপালো সরকার

শিশু থেকে আবাল বৃদ্ধ-বণিতা, তা দরিদ্রই হোক আর হত দরিদ্রই হোক, মাথার ওপর চাল-চুলা থাকুক না থাকুক, দু'বেলা খাবার জুটুক না আর জুটুক – সবারই মাথাপিছু ঋণ ৬০ হাজার টাকা। গেল একবছরে দেশের মানুষ প্রতি এই ঋণ বেড়েছে ৯ হাজার টাকা। বাংলাদেশ পদোন্নতি পেয়ে 'স্বল্পোন্নত' থেকে নাম লিখিয়েছে 'উন্নয়নশীল' দেশের কাতারে। আর দেশের উন্নয়নে রবি ঠাকুরের 'সামান্য ক্ষতি' কবিতার মতো মানুষ মাথাপিছু ঋণভারে জর্জরিত হয়েছে মাত্র। বাংলাদেশের মোট ঋণের পরিমাণ প্রায় ১০ লাখ কোটি টাকা, যা সোয়া ১৬ কোটি মানুষ দিয়ে ভাগ দিলে দাঁড়ায় এই অংক। টানা ১০ বছর ন্যূনতম জবাবদিহিতা-স্বচ্ছতার তোয়াক্কা না করে আওয়ামী লীগ সরকারের শনৈ শনৈ উন্নতিতে খেসারতের নমুনা মাত্র এটি। এখানেই শেষ নয়, অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবিত বাজেট বাস্তবায়নে আগামী বছরে আরও সাড়ে ৭ হাজার টাকা বেড়ে মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে সাড়ে ৬৭ হাজার টাকা। বাজেটের টাকার যোগানে সরকার ১ লাখ ২১ হাজার কোটি টাকা ঋণ নেয়ার পরিকল্পনা করেছে। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে জনগণের করের টাকায় যত লুটপাট বাড়বে, ততই বাড়বে ঋণের বোঝা। তাইতে সুদ পরিশোধেই বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫১ হাজার কোটি টাকার বেশি। এই টাকা দিয়ে অন্তত দুটি পদ্মা সেতু নির্মাণ করা সম্ভব, যা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে মোট বরাদ্দের দ্বিগুণের চেয়ে বেশি।

বাজেট: ধনীদের সুবিধা বেড়েছে

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, বহুল প্রচলিত এই প্রবাদ বাক্যের ব্যাখ্যা সবারই জানা। একবাক্যে বললে এবারের বাজেটে কৌশলে জনগণের ওপর সেই খাঁড়ার ঘা চাপিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে জীবনযাত্রার ব্যয় মেটাতে নাভিশ্বাস উঠা মানুষের কাছ থেকে শুষে নিংড়ে টাকা আদায়ের অভিনব বেশ কিছু প্রস্তাব রয়েছে। কিন্তু এমনভাবে করা হয়েছে যাতে চট করেই কেউ বুঝতে না পারেন, ধরতে না পারেন কীভাবে করের বোঝা চাপানো হয়েছে। উল্টো দিকে উচ্চবিত্তসহ সম্পদশালীদের জন্য বাজেটে নানা রকমের ছাড় দিয়েছেন। ব্যাংকের উদ্যোক্তাসহ ২০ ভাগ ধনিক শ্রেণীকে সুযোগ করে দিয়েছেন আরও সম্পদশালী হওয়ার। এর অংশ হিসেবে ব্যাংক-বীমার করপোরেট কর আড়াই শতাংশ কমিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। মালিকপক্ষকে এই সুবিধা দিলেও বিনিয়োগ বৃদ্ধি হবে না, কমবে না ব্যাংকের ঋণের সুদ হার, এমনকি ব্যাংকের আমানতকারী জনগণের স্বার্থ রক্ষাও হবে না। তাহলে কাদের খুশি করতে ছাড় দেয়া হলো? উত্তরটা দিয়েছে গবেষণা সংস্থা সিপিডি। *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিপরীতে

বাম গণতান্ত্রিক জোটের আত্মপ্রকাশ

১৮ জুলাই সকাল ১১টায়, পুরান পল্টনস্থ মৈত্রী মিলনায়তনে জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে আট দলের সমন্বয়ে 'বাম গণতান্ত্রিক জোট' এর ঘোষণা দেন বামপন্থী নেতৃবৃন্দ। সংবাদ সম্মেলনের প্রারম্ভিক বক্তব্য দেন বাসদ সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান, লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক। সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তর করেন সিপিবি সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শুভ্রাংশু চক্রবর্তী। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক।

সংবাদ সম্মেলনে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে বলা হয় রাষ্ট্র ও সরকারের ফ্যাসিবাদী প্রবণতা বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের 'উন্নয়নে'র রাজনীতিতে ধনী গরিবদের মধ্যে আয় ও সম্পদের সীমাহীন বৈষম্য বাড়ছে। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের 'নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনের' মডেল নির্বাচন ও জনগণের ভোটাধিকারকে প্রহসনে পরিণত করেছে। *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

স্যাটেলাইটের ভাবমূর্তি ও হিসাবের অতি-স্বচ্ছতা পৃষ্ঠা-৩

ঐতিহাসিক চা শ্রমিক হত্যা দিবস পালিত পৃষ্ঠা-৪

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংকট পৃষ্ঠা-৬

ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার লড়াই চলছে পৃষ্ঠা-৭

কৌশলে জনগণের ঘাড়ে করের বোঝা চাপালো সরকার

(১ম পৃষ্ঠার পর) তারা বলছে, "ভোটের টাকার যোগানদাতাদের খুশি রাখতে এমন করা হয়েছে।" ব্যাংকিং খাতে নৈরাজ্য-লুটপাট বন্ধ না করে মালিকপক্ষকে একের পর সুবিধা দেয়ায় প্রশ্ন তুলেছেন সবাই। একইভাবে হাইব্রীড গাড়ি আনার শুল্ক ৪৫ থেকে কমিয়ে করেছেন ২০ ভাগ। অন্যদিকে রিকন্ডিশনড বা পুরনো গাড়ীর দাম বাড়ানোর সুপারিশ করেছেন। পুরনো গাড়ীর সিংহভাগ ক্রেতা মধ্যবিত্ত শ্রেণী, আর হাইব্রীড গাড়ীর ক্রেতা উচ্চবিত্তরা। এতে মধ্যবিত্তদের বাড়তি পয়সা গুণতে হবে গাড়ী কিনতে আর সাশ্রয়ী হবে উচ্চবিত্তদের গাড়ীর বেলায়। এভাবে বৈষম্যকে উস্কে দেয়ার রাষ্ট্রীয় নীতিতেই চলছে দেশ, বাজেটে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

গরীব আরও গরীব হবে

মধ্যবিত্তদের গাড়ীর মূল্যবৃদ্ধির মতো কেউ ছোট ফ্ল্যাট কিনতে গেলে বাড়তি টাকা গুণতে হবে। ১১শ' বর্গফুট ফ্ল্যাটের নিবন্ধন খরচ দশমিক পাঁচ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। অন্যদিকে ১১শ' থেকে ১৬শ' বর্গফুটের বেলায় কমিয়েছে দশমিক পাঁচ শতাংশ। ছোট ফ্ল্যাটে খরচ বাড়িয়ে অর্থমন্ত্রী বড় ফ্ল্যাটের খরচ কমিয়েছেন। যারা একটু ঋণ নিয়ে নিজের জন্য মাথা গোঁজার ঠাঁই কিনতে চায় তাদের নিরুৎসাহিত করা হলো। সবাই যখন দ্রুতগতিতে আয় বৈষম্যের বৃদ্ধি কমিয়ে আনার তাগিদ দিচ্ছেন, তখন অর্থমন্ত্রী হাঁটছেন উল্টো পথে। তারপরও কি এই বাজেট জনবান্ধব?

উন্নত-উন্নয়নশীল সব দেশই রাজস্ব আদায়ে বেশি গুরুত্ব দেয় ব্যক্তি ও কোম্পানীর আয় থেকে। যা প্রত্যক্ষ কর হিসেবে পরিচিত। অথচ বাংলাদেশে দিনে দিনে কমছে আয়কর বা প্রত্যক্ষ করের অবদান। বাড়ছে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট এবং আমদানী শুল্ক থেকে, যা পরোক্ষ কর হিসেবে পরিচিত। পরোক্ষ কর মানে দোকান থেকে কোনো পণ্য বা জিনিস কিনলেই নির্ধারিত ভ্যাট-শুল্ক কেটে রাখবে দোকানীরা। আপনার আয় করযোগ্য হোক কিংবা না হোক আপনাকে ভ্যাট দিতে হবে। একজন দিনমজুর কিংবা ভিখেরীও যদি দোকান থেকে কিছু কেনেন তা হলে তাকেও ভ্যাট দিতে হবে। ১৬ কোটি মানুষকেই ভ্যাট দিতে হবে। ধনীরা যে হারে দেবে, গরীবকেও সেই ভ্যাট দিতে হবে। এ কারণে পরোক্ষ করকে সামাজিকভাবে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয়। এতদিন সর্বনিম্ন স্তরে ভ্যাট হার ছিল দেড় শতাংশ, বাজেটে তা বাড়িয়ে করা হয়েছে দুই শতাংশ। এখানেও আধা শতাংশ বেশি পয়সা গুণতে হবে দেশের মানুষকে। সাথে ৬ হাজারের বেশি পণ্যে আমদানী শুল্ক ১ শতাংশ বাড়ানোয় এসব পণ্যের দাম বাড়বে। এমনিতেই ব্যবসায়ীরা মুখিয়ে থাকে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির আশায়, সেখানে নতুন সিদ্ধান্তে আরও এক দফা বাড়বে দ্রব্যমূল্য। আর ব্যবসায়ীরা জনগণের কাছ থেকে ভ্যাট আদায় করলেও শেষ পর্যন্ত তা কতোটা সরকারের কোষাগারে জমা পড়ে তা নিয়েও রয়েছে সংশয়। দুনিয়াজোড়া সবাই যখন রাজস্ব আদায়ে প্রত্যক্ষ করের উপর জোর দিচ্ছে

তখন কেন অর্থমন্ত্রী উল্টো পথে হাঁটছেন? কারণটা সবারই জানা, ভ্যাট ও শুল্ক আদায় করা সহজ, হরেদরে সবাইকে কিছু কিনলেই ভ্যাট দিতে হবে। কিন্তু এটা এমন কৌশলে করা হচ্ছে যাতে কেউ এ নিয়ে খুব বেশি কথাবার্তা বলতে না পারে। দারুণ এক কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন তিনি।

চার বছর আগে করমুক্ত ব্যক্তির আয় সীমা আড়াই লাখ টাকা করা হয়েছিল। প্রতিবছর ৬ শতাংশ মূল্যস্ফীতি ধরলেও এই অংকটা বেড়ে তিন লাখ টাকা হওয়ার কথা। কিন্তু সরকারের বক্তব্য এ সিদ্ধান্ত নেয়া হলে অনেক মানুষ যারা এখন কর দিচ্ছেন তারা সীমার বাইরে চলে যাবে, সরকার রাজস্ব হারাবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাহলে ব্যাংকিংখাতে করপোরেট হার কেন কমালেন তিনি? ব্যাংকগুলো প্রতিবছর শত শত কোটি টাকা মুনাফা করছে। আর এই মুনাফায় ফুলে ফেঁপে ওঠাদের কর কমানোর যুক্তিই বা কী? তবে কি সিপিডি'র আশংকাই ঠিক যে, আগামী নির্বাচনের তহবিল মোটাতাজাকরণেই ব্যাংক ব্যবসায়ীদের ছাড় দেয়া হয়েছে পরিকল্পিতভাবে?

ভাড়ায় গাড়ী ও মোটর সাইকেল সেবা প্রদানকারী উবার এবং পাঠাও ব্যবহারে কর গুণতে হবে। কর বসানোর ঘোষণা দিয়েছেন ভার্চুয়াল কেনাকাটা বা অনলাইন শপিং এর ওপর। ভ্যাট বসিয়েছেন ব্র্যান্ডের দোকান থেকে পোষাক কেনার ওপরেও।

রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অবাস্তব

দ্বিতীয় মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ বাজেটের আকার ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা। বাজেটের আকার নিয়ে রয়েছে বির্তক, যদিও একে বিশাল বলতে নারাজ অর্থমন্ত্রী। কিন্তু প্রশ্ন হলো কোন্ বিবেচনায় অর্থমন্ত্রী নির্ধারণ করলেন প্রায় চার লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকার বাজেট? কেনই বা তিনি ৫ লাখ কোটি টাকা করতে চেয়েছিলেন? দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন যোগ্যতার ভিত্তিতে হচ্ছে, না কী অর্থমন্ত্রীর ব্যক্তিগত '৫ লাখ কোটি টাকার' মাইলফলক ছোঁয়ার খায়েশ পূরণে আকার নির্ধারণ করা হচ্ছে তা জানা জরুরি। স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেই যে টাকার বাজেট বাস্তবায়নে হিমশিম খাচ্ছে, সেখানে জাতীয় নির্বাচনের বছরে বাড়তি ১ লাখ কোটি টাকার বাস্তবায়ন কীভাবে সম্ভব? নির্বাচনের ডামাডোলের বছরে স্থানীয় প্রশাসনসহ সরকারি কর্মকর্তারা 'ওয়েট এন্ড সি' ভঙ্গীতে কাজ করবেন। একদিকে দক্ষতা-স্বচ্ছতা বাড়েনি, অন্যদিকে নির্বাচনের বছর হওয়ায় নিশ্চিতভাবেই আগামী অর্থবছরের বিশাল এই বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না।

লুটপাটের ক্ষেত্র উন্নয়ন বাজেট

আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে এক লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা। চলতি বাজেটে এক লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকার এডিপি বাস্তবায়ন করা যায়নি। এমনকি কাটঁছাট করে তা ১ লাখ ৫৩ হাজার কোটি টাকা করা হলেও তার বাস্তবায়ন নিয়ে রয়েছে যথেষ্ট সংশয়। আবার যতটা বাস্তবায়ন হবে তারও সিংহভাগ টাকাই খরচ করা হয় জুন মাসে। ফলে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে অর্থবছরের শেষ মাসে তাড়াহুড়া করে টাকা ছাড় হয়, কাজের কাজ কিছুই হয় না। যাও হয় তা যেনতেন ভাবে। বিন্দুমাত্র নজরদারি ও জবাবদিহিতা নেই, আদৌ টাকা খরচ হচ্ছে কি'না বা প্রকৃত কাজটা হয়েছিল কি'না তাও খতিয়ে দেখা হয় না। এর মাধ্যমে বৈধভাবে জনগণের প্রদত্ত করের হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাটের রাষ্ট্রীয় আয়োজন চলে। রাতারাতি পুঁজিপতি বানানোর অভিনব ব্যবস্থা গড়ে ওঠে পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থায়। এতে করে প্রকল্প পরিচালকসহ মন্ত্রী-এমপি ও দলীয় সুবিধাভোগী অল্প কিছু মানুষ ক্রমেই সম্পদশালী হয়ে উঠছে। অনেকটা ওপেন সিক্রেটের মতো শেষ মাসে টাকা ছাড় করতে চলে ঘুষ বাণিজ্য, দুর্নীতি আর স্বজনপ্রীতি।

আগামী বাজেটে এই লুটপাট লাগামহীন করার সুযোগ করে দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। বলেছেন, "বাজেট পাশের পর দিন থেকেই টাকা খরচ করতে পারবে মন্ত্রণালয়গুলো। এর জন্য অর্থমন্ত্রণালয়ের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই।" এ সিদ্ধান্ত নেয়ার উদ্দেশ্য বুঝতে কাউকে গবেষক হওয়ার দরকার পরে না। বরাদ্দকৃত টাকা যে যার ইচ্ছামাফিক তুলবে এবং খরচ করবে। স্বাভাবিকভাবে কাজের কাজ কিছু না করেই সরকারদলীয় ঠিকাদারসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা হাতিয়ে নেয়ার সুযোগ করে নিল।

বৈষম্য উস্কে দেয়ার বাজেট

ফলে বাজেটের আকার যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে বৈষম্য। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, মাত্র ১০ ভাগ ধনীদের হাতে দেশের প্রায় ৮০ ভাগ সম্পদ কুক্ষিগত হচ্ছে। এই ধনীদের মধ্যে হাতে গোণা শীর্ষ কয়েকজনের নিয়ন্ত্রণে ধনীদের মোট সম্পদের ৯০ভাগ। উল্টোদিকে দেশের নিম্ন আয়ের ১০ শতাংশ মানুষের আয় কমেছে। পাহাড়সম বৈষম্যের চাপে দিনে দিনে বেঁচে থাকার সম্পদ হারিয়ে দরিদ্র মানুষগুলো হচ্ছে আরও হতদরিদ্র।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দারিদ্র্য বিমোচনের পরিসংখ্যানও প্রমাণ দিচ্ছে সেই কথার। তথাকথিত শনৈ শনৈ উন্নতির পরও কেন থমকে আছে দারিদ্র্য বিমোচন সেই প্রশ্ন তুলেছেন অর্থনীতিবিদরা। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে প্রতিবছর লাখ লাখ কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেটের টাকা যাচ্ছে কোথায়? কাদের উন্নয়ন হচ্ছে? দেশের উন্নয়ন মানে তো দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন। এত এত উন্নয়নের পরও কেন উত্তরের জেলা কুড়িগ্রামে একশ জনের মধ্যে ৭১ জনই দরিদ্র? কেন দিনাজপুরের শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে? এসব তথ্য খোদ সরকারি সংস্থা পরিসংখ্যান ব্যুরোর, যা সম্প্রতি তুলে ধরেছে গণমাধ্যম। তাহলে জনগণের করের টাকায় উন্নয়নের সুফল যাচ্ছে কাদের পকেটে? বাজেট শুধু সরকারের একবছরের আয়-ব্যয়ের দলিল নয়। এখানে রাষ্ট্রীয় পলিসি থাকে, যা কাকে কখন কতটা গুরুত্ব দেবে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজিবাদী মুনাফামুখী ব্যবস্থায় এভাবেই উন্নয়নের লাভের গুড় পিঁপড়া খেয়ে ফেলছে।

বাম গণতান্ত্রিক জোটের আত্মপ্রকাশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্যে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পূর্বে জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে বর্তমান সরকারের পদত্যাগ, সকল দল ও সমাজের অপরাপর অংশের মানুষের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার গঠন, বর্তমান নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন এবং গোটা নির্বাচনী ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের আহ্বান জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে ভারত, মার্কিন ও পাকিস্তানসহ বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের অপতৎপরতা চলছে। নির্বাচন সামনে রেখে বড় দুই দলের বিদেশি প্রভুদের কাছে ধর্ণা বাংলাদেশে বিদেশিদের হস্তক্ষেপের সুযোগ বাড়িয়ে তুলেছে, বিপদগ্রস্ত করছে দেশের সার্বভৌমত্বকে।

প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রশ্নের জবাবে সিপিবি নেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, 'নির্বাচনকে যে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে এর বিরুদ্ধে আমরা একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই। আমরা নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার চাই। সেখানে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা চালু করতে চাই। নির্বাচনে টাকার খেলা, পেশিশক্তি, প্রশাসনিক কারসাজি থেকে নির্বাচনকে মুক্ত করতে চাই।'

বর্তমান সরকারের অধীনে কোনও নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে পারে না অভিযোগ করে সেলিম বলেন, 'আগামী নির্বাচনের আগে পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে হবে। নির্বাচনকালে যাতে প্রকৃত নিরপেক্ষ সরকার এবং নির্বাচন কমিশন থাকে সেই জন্য সংবিধান সংশোধন করে হলেও সেই ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করতে হবে।'

এটি নির্বাচনী জোট কি না – এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'জনগণের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত করাই জোটের লক্ষ্য। সেটাকে ভোটের সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্যও আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে। কিন্তু এই জোট ভোট সর্বস্ব জোট না, এটা ইলেকশন এলায়েন্স না। ইলেকশনটা আমাদের সামগ্রিক আন্দোলনের একটা অংশ। আন্দোলনের স্বার্থে ভোটে আমরা অংশগ্রহণ করতে পারি, আবার বয়কটও করতে পারি।'

সরকারের সঙ্গে থাকা বাম দলগুলো এই জোটে আসতে পারবে কিনা - এমন প্রশ্নের জবাবে সেলিম বলেন, 'প্রকৃত বামপন্থীরা রাজপথে নামলে পরে তাদের সঙ্গে মিলিতভাবে এই জোট আরও সম্প্রসারিত হতে পারে। কিন্তু যারা শাসক শ্রেণীর সঙ্গে, এই ফ্যাসিস্ট দুঃশাসনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তারা আমাদের এই চিন্তা বা আহ্বানের আওতাভুক্ত না। আমাদের লড়াই তাদের বিরুদ্ধেও।'

সংবাদ সম্মেলনে আটটি রাজনৈতিক দল– বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী), গণসংহতি আন্দোলন, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি, ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সমন্বয়ে 'বাম গণতান্ত্রিক জোট' গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

কর্মসূচি

ক) দুঃশাসন, জুলুম, দুর্নীতি-লুটপাটতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র প্রতিরোধ এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে আগামী ২৪ জুলাই ঢাকাসহ দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকায় বিকাল ৪টায় প্রেসক্লাবের সম্মুখে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

খ) ৪ আগস্ট, ২০১৮ ভোটাধিকার নিশ্চিত করা এবং বিদ্যমান নির্বাচনী ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের দাবিতে ঢাকায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে।

গ) আগামী ১০ ও ১১ আগস্ট দেশের ৬টি বিভাগীয় শহর, যথাক্রমে চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী ও রংপুরে সভা, সমাবেশ, জনসভা, মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। জোটের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এসব কর্মসূচিতে অংশ নেবেন।

স্যাটেলাইটের ভাবমূর্তি ও হিসাবের অতি-স্বচ্ছতা

গত ১২ মে মহা আড়ম্বরের সাথে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে দেশের প্রথম স্যাটেলাইট ‘বঙ্গবন্ধু-১’। আগামী ৩ মাসের মধ্যে স্যাটেলাইটটি সেবা দেয়া শুরু করবে। স্যাটেলাইটটির জীবনকাল ১৫ বছর। নিজস্ব স্যাটেলাইটের অধিকারী বিশ্বের ৫৭তম দেশ বাংলাদেশ।

গত ১৬ মে এক অনুষ্ঠানে সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার জানিয়েছেন, এই স্যাটেলাইট নির্মাণ ও উৎক্ষেপণের জন্যে যত ব্যয় ধরা হয়েছিল তার চেয়ে ২০০ কোটি টাকা কম হয়েছে। প্রকল্পের শুরুতে এর মোট খরচ ধরা হয়েছিল ২ হাজার ৯৬৭ কোটি ৯৫ লাখ ৭৭ হাজার টাকা। স্যাটেলাইটের কাঠামো, উৎক্ষেপণ-ব্যবস্থা, ভূমি ও মহাকাশের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা, ভূ-স্তরে দুটি স্টেশন পরিচালনা ও ঋণের ব্যবস্থা করেছে ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠান থ্যালেস এলেনিয়া স্পেস। যদিও এই নির্মাণ ব্যয় সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট তথ্য সংবাদমাধ্যমগুলোতে পাওয়া যায়নি।

সরকারের পক্ষ থেকে প্রদত্ত তথ্যে আরো জানা গেছে, স্যাটেলাইটটিতে ৪০টি ট্রান্সপন্ডার থাকবে। ২০টি ট্রান্সপন্ডার বাংলাদেশের ব্যবহারের জন্য এবং বাকি ২০টি ট্রান্সপন্ডার বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ডিটিএইচ (ডাইরেক্ট টু হোম) সেবা, স্যাটেলাইট টেলিভিশনের সম্প্রচার এবং ইন্টারনেট সুবিধাসহ ৪০ ধরনের সেবা পাওয়া যাবে এই স্যাটেলাইট থেকে। বর্তমানে বিদেশি স্যাটেলাইটের ভাড়া বাবদ প্রতিবছর ১ কোটি ৪০ লাখ ডলার খরচ হয়। (১২ নভেম্বর ২০১৫, প্রথম আলো) সরকার আশা করছে, স্যাটেলাইট ভাড়া বাবদ ব্যয় হওয়া এ অর্থ সাশ্রয় হবে। (মে ১৬ ২০১৮)

‘বঙ্গবন্ধু-১’ একটি জিও-স্টেশনারি স্যাটেলাইট বা ভূ-স্থির উপগ্রহ। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীর সাথে একই গতিতে ঘুরবে। ৩৬ হাজার কি.মি. উপর থেকে এটা পৃথিবীর সাথে সাথে ঘুরবে। এর ওজন প্রায় ৩৬০০ কেজি।

আমরা স্যাটেলাইটের জটিল কারিগরি নানা দিক নিয়ে আলোচনা করে পাঠকদের ভারাক্রান্ত করতে চাই না। যে দু-চারটি তথ্য সংবাদমাধ্যমে এসেছে সেগুলো ধরে কিছু বিষয় তুলে ধরতে চাই।

ছয়বার উৎক্ষেপণের তারিখ পরিবর্তনের পর ৭ম তারিখে প্রথম দফায় ব্যর্থতার পর দ্বিতীয় দফায় স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয়। এছাড়া স্যাটেলাইটটি ফ্রান্স থেকে আমেরিকার ফ্লোরিডায় নেওয়ার পর প্রথম পরীক্ষাতেই তাতে ত্রুটি ধরা পড়ে। আবহাওয়া জনিত সমস্যায় কিছু করার থাকে না। কিন্তু কেউ যদি পুরো ঘটনাবলী খেয়াল করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে বিষয়টি সম্পর্কে সরকারের মন্ত্রী-আমলাদের অজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক প্রচারণার তাগাদা বিষয়টিকে জটিল করেছে। ইতোমধ্যে প্রশ্ন উঠেছে – এত বিপুল ব্যয়ে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ দেশের কি কাজে লাগবে? এতে কার লাভ হবে?

ব্যয় ও মালিকানা

সরকারের পক্ষ থেকে জোর গলায় দাবি করা হয়েছে যে এর ব্যয় ও মালিকানায় কোনো অস্বচ্ছতা নেই। কিন্তু সরকারের দাবি মেনে নেয়া সত্যিই কঠিন।

(১) ৪ মার্চ দৈনিক প্রথম আলোর প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, “বেক্সিমকো গ্রুপ এবং বায়ার মিডিয়া এই পুরো টিভি চ্যানেল ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ এবং সিগন্যাল বিকিকিনির পুরো ব্যবসায়িক দিকটি উপভোগ করবে। এদের ছাড়া অন্য কোনো কোম্পানি এখানে ডিটিএস প্রযুক্তির ব্যবসায় নামতে পারবে না বলে জানানো হয়েছে।” ওই সংবাদে আরো বলা হয়েছে – “কোন্ পন্থায় মাত্র দুটি কোম্পানিকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যান বিটিআরসির চেয়ারম্যান। তিনি জানান, ‘এটি তথ্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত। এটা স্পর্শকাতর একটি বিষয়, আমার কাছে সঠিক উত্তর নেই’।”

(২) ব্যয়ের ক্ষেত্রেও কিছু অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। স্যাটেলাইটের নির্মাণ ও উৎক্ষেপণে সরকারের তহবিল থেকে দেয়া হচ্ছে ১ হাজার কোটি টাকা। আর ঋণ হিসাবে এইচএসবিসি ব্যাংক থেকে বাকি ১ হাজার ৩৫৮ কোটি টাকা নেয়া হয়েছে। এই যে ঋণ নেয়া হল, তার সুদ কত? সেটা কি ব্যয়ের হিসাবে ধরা হয়েছে? সম্ভবত না।

(৩) একই সাথে এই স্যাটেলাইট পরিচালনার জন্যে গাজীপুর ও রাঙামাটিতে যে দুটি গ্রাউন্ড স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলোর ব্যয় কি স্যাটেলাইটের মোট ব্যয়ের সাথে দেখানো হয়েছে? ১৫ বছর পর যখন ‘বঙ্গবন্ধু-১’ অকেজো হয়ে যাবে তখন গাজীপুর ও রাঙামাটির গ্রাউন্ড স্টেশন দুটি কি কাজে লাগবে সেটা কি সরকারের পরিকল্পনায় আছে? স্যাটেলাইটের প্রতিবছর পরিচালনা ব্যয়, মন্ত্রী-আমলাদের বিদেশ ভ্রমণ ব্যয় কোন্ হিসাবে যুক্ত হবে?

(৪) মোটামুটি একই ধরনের একটি স্যাটালাইট বানাতে ভারতের মোট ব্যয় হয়েছে ৬৯ মিলিয়ন ডলার। আর আমাদের ব্যয় হয়েছে ২৩০ মিলিয়ন ডলার। এই বিরাট তারতম্য কেন?

স্যাটেলাইট ভাড়া বাবদ ব্যয় হওয়া অর্থ সাশ্রয়

বলা হচ্ছে যে এখন দেশীয় টিভি চ্যানেলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিদেশী সংস্থার কাছে স্যাটেলাইটের ক্যাপাসিটি ভাড়া দিয়ে আমাদের আয় হবে। যে টাকা এখন আমরা বিদেশীদের দেই তা সাশ্রয় হবে। আসুন এ দাবিটা একটু যাচাই-বাছাই করে দেখি।

মিয়ানমার সরকার ২০১৯ সালে একটি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করবে। মিয়ানমার ইতোমধ্যেই দুটি কোম্পানির সাথে ক্যাপাসিটি বুক করে ফেলেছে। অর্থাৎ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের আগেই ক্যাপাসিটি বিক্রি শুরু হয়েছে। পাকিস্তান ২০১১ সালে একটি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে যার ৬০% ট্রান্সপন্ডার ক্যাপাসিটি আগেই চুক্তি করা হয়েছিল। আর আমরা এমন কোনো চুক্তি করেছি বলে জানা নেই। অথচ ইতোমধ্যে ১৫ বছরের জন্যে ৩ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়ে গেছে!

বলা হচ্ছে যে দেশীয় অপারেটরদের কাছে স্যাটেলাইট সুবিধা বিক্রি করা হবে। অথচ বেসরকারি টেলিভিশন মালিকরা জানিয়েছেন যে, তাদের জন্যে বর্তমানের ৯০ ডিগ্রি বা ৮৯ ডিগ্রিতে স্থাপিত সিঙ্গাপুর বা চায়নার বাণিজ্যিক স্যাটেলাইটগুলোই সুবিধাজনক। কারণ এগুলো যে কৌণিক অবস্থানে আছে তাতে ভালো ট্রান্সমিশান পাওয়া যাবে, যেটা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটে পাওয়া যাবে না। আর তাছাড়া দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নিশ্চয়ই কোনো না কোনো স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সেবা নিচ্ছে এবং তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ। চাইলেও কেউ একটা চুক্তি থেকে সরে আসতে পারে কি? বিদেশী অপারেটর দূরে থাক, এখনো দেশীয় কোনো অপারেটরই এই স্যাটেলাইটের সুবিধা কিনতে রাজি হচ্ছে না।

বলে রাখা ভালো যে ভারত ‘সাউথ এশিয়ান স্যাটেলাইট’ নামের একটি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে যে স্যাটেলাইটে তারা ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছে। এই সার্ভিস নিতে ২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রী নিজেই চুক্তি স্বাক্ষর করে এসেছেন। এরকম ফ্রি সার্ভিসের সুবিধা শ্রীলঙ্কা নেপালের জন্যেও রাখা আছে। আবার শ্রীলঙ্কার নিজেরই স্যাটেলাইট আছে। তাহলে কিনবে কে? এমনকি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের জিওস্টেশনারি লোকেশনের মধ্যে থাকা ইন্দোনেশিয়া এবং মালেশিয়ারও নিজস্ব স্যাটেলাইট আছে। তাহলে আমাদের স্যাটেলাইটের সুবিধা কে কিনতে আসবে? কিসের ভিত্তিতে বলা হচ্ছে বেদেশি কোম্পানি আমাদের সেবা কিনবে এবং আমাদের আয় হবে, দেশের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে ?

দুর্গম জায়গায় ইন্টারনেট সংযোগ

বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশের দুর্গম অঞ্চলে, ১৮০টি উপজেলায় ফাইবারের কানেকশান নেই। এসব জায়গায় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হবে।

প্রশ্ন হল, এসব দুর্গম জায়গায় স্যাটেলাইটের কানেক্টিভিটি রিসিভ করার জন্যে ভিস্যাট যন্ত্র কারা বসাবে? সেই রিমোট জায়গায় ভিস্যাটের বিদ্যুৎ সংযোগ কোথা থেকে আসবে? সেখানে ইন্টারনেট সেবার গ্রাহক কারা হবে? এসব প্রশ্নের কোনো যথাযথ উত্তর নেই, কোনো তথ্য-উপাত্তও নেই।

ভূপৃষ্ঠ থেকে স্যাটেলাইটের দূরত্ব হল ৩৬ হাজার কিলোমিটার। এই দূরত্বের কারণে সিগন্যাল যেতে আসতে প্রচুর সময় লাগবে। স্যাটেলাইট ইন্টারনেটের কানেকশান খুবই দুর্বল হবে। ফলে স্যাটেলাইটের কারণে আমাদের মোবাইলের থ্রিজি ফোরজি সুবিধা বাড়বে – এটাও একটা হাস্যকর তথ্য।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহযোগিতা পাওয়া

কোনো কোনো সংবাদমাধ্যমে এমন কথাও আলোচনা হয়েছে যে এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহযোগিতা পাব। অথচ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট একটা কমিউনিকেশান স্যাটেলাইট (অর্থাৎ যোগাযোগের জন্য নির্মিত) এবং এটাতে কোনো ধরনের ইমেজিং, রিমোট সেন্সিং বা ক্যামেরা রাখা হয়নি। ফলে এই স্যাটেলাইট দিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহযোগিতা পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

ভাবমূর্তি নাকি বিশেষ গোষ্ঠীর ব্যবসা?

স্যাটেলাইটের কিছু সাধারণ দিক আমরা আলোচনা করলাম। এসব সমালোচনার মুখে কেউ কেউ একটু অভিমানের সুরে বলার চেষ্টা করেন যে, এই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে দেশের যে ভাবমূর্তি উপরে উঠেছে’ সেটা কেউ খেয়াল করছে না।

আসলে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীকে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুবিধা করে দেয়ার জন্যে দেশের মানুষের হাজার কোটি টাকা লুট করে এই ‘অশ্বডিম্ব’ ভাবমূর্তি কারা চায়?

ধানসহ কৃষি ফসলের লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করার দাবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) মণ ও শুকনো ধান ৬শ-সাড়ে ৬শ টাকা মণ বিক্রি হচ্ছে।”

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, “সারাদেশের কৃষকদের ধান বিক্রির জন্য পর্যাপ্ত ক্রয়কেন্দ্র ও সংরক্ষণের জায়গা নেই। বাধ্য হয়ে কৃষকরা কম দামে মধ্যস্বত্ত্বভোগী ফড়িয়া ও চাতাল মালিকের দালালদের কাছে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। প্রতিবারই সরকার সংগ্রহ অভিযান শুরু করতে দেরি করে এবং অল্প ধান কিনে বেশিরভাগ চাল ক্রয় করে। কৃষকরা মহাজনি ঋণ পরিশোধ করার তাগিদে ও সংসার খরচ যোগাড় করতে কম দামে লোকসানে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয়। আমাদের অধিকাংশ কৃষক বর্গা বা প্রান্তিক চাষী। বেশির ভাগ কৃষকই ঋণ নিয়ে চাষাবাদ করেন। ক্ষেতের ধান উঠলে তাদের সে ঋণ শোধ করতে তাগাদা দেয় ঋণ প্রদানকারীরা। পাওনাদারদের চাপে অধিকাংশ সময় কৃষকেরা সরকারের ন্যায্য মূল্যের আশায় বসে না থেকে অনেক কম দামে ধান বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়ে থাকেন। তাছাড়া, সরকারী খাদ্য গুদামে ধান দিতে গেলে ধরতে হয় বিভিন্ন দালাল ও সরকারী দলের নেতাকর্মীদের। এবছর বৃষ্টির কারণে ঠিকমত ধান শুকাতেও পারছেন না কৃষকরা। বিক্রি করার সময় কৃষক দাম পাচ্ছেন না, অথচ ক্রেতাকে বাজার থেকে চাল কিনতে হচ্ছে চড়া দামে। ফলে, বাম্পার ফলনের সুফল না কৃষক না ভোক্তা কেউই পাচ্ছে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে লাভবান হয় ব্যবসায়ী, সরকারী দলের নেতা-কর্মী ও আমলারা। সরকারিভাবে হাটে হাটে ক্রয়কেন্দ্র চালু, সঠিক সময়ে তৎপরতার সাথে ধান সংগ্রহ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের সমন্বয়ে কমিটির মাধ্যমে কৃষকদের তালিকা প্রণয়ন করে সরাসরি চাষীদের কাছ থেকে ধান কিনতে সরকারকে বাধ্য করতে হলে জোরদার চাষী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।”

র‍্যাব-পুলিশকে বিনা বিচারে হত্যার লাইসেন্স দিয়েছে সরকার

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বিরোধী অভিযানের *(শেষ পৃষ্ঠার পর)* নামে শতাধিক মানুষের নির্বিচার হত্যাকান্ডের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও উদ্বেগ জানিয়েছেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। সংবাদপত্রে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, “মাদক ব্যবসার নিয়ন্ত্রক সরকারের সাথে নানা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট এমপি, জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতা এবং পুলিশ-র‍্যাব-সামরিক বাহিনী-সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বড় কর্তাসহ প্রধান কুশীলবদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রেখে মাঠ পর্যায়ের কিছু মানুষকে হত্যার মাধ্যমে মাদকের নির্মূল তো হবেই না, উল্টো র‍্যাব-পুলিশের বেপরোয়া তৎপরতা বৈধতা পাবে। প্রবল প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মাধ্যমে এ জাতীয় কর্মকান্ড ঠেকানো না গেলে ভবিষ্যতে দেশে গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিসর আরও সংকুচিত হবে, আরও বেপরোয়া উন্মত্ত দুঃশাসন জনগণের ওপর চেপে বসবে।”

তিনি বলেন, “মাদক ব্যবসার বিস্তৃত নেটওয়ার্কে যারা ব্যবহৃত হয় তারা একদিকে দারিদ্র্য ও বেকারত্বের বলি, অন্যদিকে সমাজের চলতে থাকা নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার। তাই আইন বা হত্যা করে মাদক বন্ধ করা যাবে না। সমাজ জুড়ে যে তীব্র বৈষম্য-বেকারত্ব তাকেই চিরতরে ঘোচাতে হবে।”

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট : সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে সাম্প্রতিক মাদক নির্মূলের নামে রাষ্ট্রীয় হত্যাযজ্ঞ বন্ধের দাবিতে ৩ জুন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্ত্তী রিন্টু, মাসুদ রেজা ও ইভা মজুমদার। নেতৃবৃন্দ বলেন, বিনা বিচারে মানুষ হত্যা রাষ্ট্রীয় বর্বরতারই একটি নমুনা।

৫০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির লক্ষ্য কি ৬ হাজার টাকার শ্রমিকের হাতে সম্ভব?

মালিকপক্ষের ও শ্রমিকপক্ষের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বিজেএমই-এর কাছে প্রশ্ন রাখেন, ২০২১ সালের মধ্যে আপনারা ৫০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির শিল্পে রূপান্তর করতে চান বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতকে। কিন্তু এই স্বপ্ন আপনরা পূরণ করবেন যে শ্রমিকদের ওপর নির্ভর করে তাদেরকে বর্তমান বাজার মূল্যে ৬ হাজার ৩৬০ টাকা মজুরি দিয়ে তা পূরণ করা কি সম্ভব? পুষ্টিহীন হত দরিদ্র কর্মীদের কাছ থেকে আর যাই হোক উৎপাদনশীলতা আশা কারা যায় না। আপনারা যে শিল্পকে নিয়ে গর্ব করেন তার সবচেয়ে বড় অংশ ৪৪ লক্ষ শ্রমিককে পেছনে ফেলে কী করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব?

১৬ হাজার টাকা মজুরির দাবিতে নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সামনে অবস্থান কর্মসূচি

গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের বর্তমান সমন্বয়কারী এবং বাংলাদেশ টেক্সটাইল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এড. মাহবুবুর রহমান ইসমাইলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের সভাপতি মোশরেফা মিশু, বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার, ওএসকে গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ দত্ত, গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতা ফখরুদ্দিন কবির আতিক, গার্মেন্টস শ্রমিক মুক্তি আন্দোলনের উপদেষ্টা শামীম ইমাম, বিপ্লবী গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সভাপতি মীর মোফাজ্জল হোসেন মোশতাক, গার্মেন্ট শ্রমিক সভার সভাপতি শামসুজ জোহা, গার্মেন্টস শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা বিপ্লব ভট্টাচার্য্যসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে পরিচয় করিয়ে দেন গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সাধারণ সম্পাদক জুলহাসনাইন বাবু এবং লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জোটের সমন্বয়কারী।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে বক্তারা আরো বলেন, বিজেএমই এর ওয়েবসাইটে বা বিভিন্ন নথিতে দেখা যায় তাদের প্রবৃদ্ধি দিনকে দিন বেড়ে চলছে। আর যখন শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির প্রশ্ন আসে তখন তারা বলেন মজুরি বৃদ্ধি করলে তাদের প্রতিযোগিতা করার শক্তি কমে যাবে, অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে, শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে? এই বৈপরিত্য কীভাবে সম্ভব? স্বাধীন কমিশন গঠন করে তাদের মুনাফা নির্ধারণ করার দাবি করেন নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, নিম্নতম মজুরি বোর্ডে শ্রমিক প্রতিনিধি বেগম শামছুন্নাহার ভূঁইয়া শ্রমিক লীগের নেত্রী হিসেবে সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী যা কিনা প্রকারান্তে মালিক পক্ষের ইশারায় ১২ হাজার ২০টাকা মোট মজুরি প্রস্তাব করেছেন। বাংলাদেশের ৪৪ লক্ষ গার্মেন্ট শ্রমিকের সাথে এটা পরিষ্কার বিশ্বাসঘাতকতা। নেতৃবৃন্দ আবারো ১৬ হাজার টাকা মজুরির দাবি সামনে নিয়ে আসেন এর নিচে কোনভাবেই শ্রমিকদের মজুরি হতে পারে না এবং শ্রমিকরাও তা মেনে নেবে না। অবিলম্বে শ্রমিকদের প্রাণের দাবি বাস্তবায়নের জন্য মজুরি বোর্ড ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ক্রসফায়ার বন্ধসহ জনজীবনের সংকট নিরসনে

বাসদ(মার্কসবাদী)'র ১০ দফার দাবি মাস

জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন, রাষ্ট্রীয় হেফাজতে বিচারবহির্ভূত হত্যা-গুম-ক্রসফায়ার বন্ধসহ জনজীবনের সংকট নিরসনে ১০ দফা দাবিতে বাসদ(মার্কসবাদী) ঢাকা নগর শাখার উদ্যোগে ৩০ জুন শনিবার বিকাল ৫টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ মানস নন্দী, জহিরুল ইসলাম, ফখরুদ্দিন কবির আতিক। বাসদ(মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটি ঘোষিত মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১০ দফা দাবিতে ২৫ জুন থেকে ২৪ জুলাই সারাদেশে জেলা-উপজেলা-এলাকায় প্রচার-গণসংযোগ, মিছিল, হাটসভা, পথসভা, পদযাত্রা, সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং ২৫ জুলাই ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এবং জেলায় জেলায় ডিসি অফিসের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ কর্মসূচি পালিত হবে। সমাবেশ শেষে একটি মিছিল বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

১০ দফা দাবিনামা

১. জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন চাই। নির্বাচনে টাকার খেলা বন্ধ কর, জামানত কমাও, অগণতান্ত্রিক দল নিবন্ধন প্রথা বাতিল কর। সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা চালু কর।

২. রাষ্ট্রীয় হেফাজতে বিচারবহির্ভূত হত্যা-গুম-ক্রসফায়ার বন্ধ কর। মত প্রকাশের অধিকার হরণ করা চলবে না।

৩. দুর্নীতি ও লুটপাট বন্ধ কর। কালো টাকার মালিক-অর্থপাচারকারী-ঋণখেলাপী-ব্যাংক লুটেরাদের গ্রেপ্তার কর, আয়ের সাথে সঙ্গতিবিহীন সম্পদ বাজেয়াপ্ত কর।

৪. নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধে দোষীদের দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাও। মাদক, পর্ণোগ্রাফী ও জুয়ার বিস্তার রোধ কর। মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন কর।

৫. চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে TCB কে সক্রিয় কর, রেশন ব্যবস্থা চালু কর। ওএমএস-এ ১০ টাকা কেজিতে চাল সরবরাহ কর। গ্যাস-বিদ্যুতের বর্ধিত দাম প্রত্যাহার কর। রেলসহ সরকারি গণপরিবহন বিস্তৃত কর। নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সরকারি উদ্যোগে অল্প ভাড়ায় বহুতলবিশিষ্ট আবাসন প্রকল্প বা কলোনী নির্মাণ কর। বাড়ি-গাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকর কর।

৬. শ্রমিকদের ন্যূনতম জাতীয় মজুরী ১৬০০০ টাকা নির্ধারণ, অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত কর।

৭. কৃষি ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হাটে হাটে সরকারি ক্রয়কেন্দ্র চাই। খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু কর। স্বল্পমূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ কর। ক্ষেতমজুরদের সারা বছর কাজ ও রেশন চাই।

৮. 'ঘরে ঘরে চাকুরী'র প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর। বেকারদের নাম তালিকাভুক্ত করে কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে বেকার ভাতা দিতে হবে। রাষ্ট্রীয় শূন্যপদে নিয়োগ দাও। সরকারি চাকুরীতে কোটা কমাও।

৯. শিক্ষা বাণিজ্য ও প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ কর। পিইসি ও জেএসসি পরীক্ষা বাতিল কর। চিকিৎসা খাতে ব্যবসা বন্ধ কর। সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার অধীনে প্রত্যেক নাগরিকের উপযুক্ত চিকিৎসা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

১০. ভারতের কাছ থেকে তিস্তাসহ সব অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় কর। রামপালে সুন্দরবন ধ্বংসকারী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎপ্রকল্প বন্ধ কর। মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎপ্রকল্প চাই না।

ঐতিহাসিক চা শ্রমিক হত্যা দিবস পালিত

দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ঐতিহাসিক ২০ মে ৯৭তম 'চা শ্রমিক দিবস' উদযাপন করেছে চা শ্রমিক ফেডারেশন। সকাল ৮টায় অস্থায়ী শহীদবেদী নির্মাণ করে মালনীছড়া, লাক্কাতুরা, তারাপুর, আলীবাহার, বড়জান, হিলুয়াছড়াসহ সিলেটের বিভিন্ন বাগানে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার মাধ্যমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করা হয় এবং কালো ব্যাজ ধারণ করা হয়। বিকাল ৪টায় মালনীছড়া চা বাগানে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি মালনীছড়া চা বাগান থেকে শুরু হয়ে রেইক্যাম্প বাজার ঘুরে আবার মালনীছড়া বাগানে গিয়ে শেষ হয়। চা শ্রমিক ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হৃদেশ মুদির সভাপতিত্বে ও মালনীছড়া বাগানের নেতা বচন কালোয়ারের পরিচালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জহিরুল ইসলাম, বাসদ (মার্কসবাদী) সিলেট জেলার আহবায়ক উজ্জ্বল রায়, শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন সিলেট জেলার সভাপতি সুশান্ত সিনহা, মালনীছড়া বাগানের আহবায়ক সন্তোষ বাড়াইক, লাক্কাতুরা বাগানের আহবায়ক লাংকাট লোহার, সন্তোষ নায়েকসহ তেলীহাটি, আলীবাহার, তারাপুর, বড়জান, লালাখালসহ বিভিন্ন বাগানের নেতৃবৃন্দ।

আলোচনা সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, আজ থেকে ৯৭ বছর আগে ১৯২১ সালের ২০শে মে চাঁদপুরের মেঘনা ঘাটে শত শত চা শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে এই দিনটি 'মুল্লুকে চল' আন্দোলন নামে খ্যাত। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের এই দিনটিকে আমরা শ্রদ্ধার সাথে 'চা শ্রমিক দিবস' হিসেবে পালন করছি। ব্রিটিশরা ১৮৩৮ সালে ভারতে চা চাষের পরিকল্পনা করলে বিভিন্ন অনুন্নত ও অভাবগ্রস্ত অঞ্চল থেকে নিঃস্ব-রিক্ত কৃষকদের আজীবন কাজের শর্তে আসামের জঙ্গলে নিয়ে আসে। সহজ সরল এই লোকগুলোকে বলা হয় আসামে নাকি "গাছ হিলায়গা তো পয়সা মিলেগা"। কিন্তু এখানে আসার পর শুরু হয় বাঘ, ভাল্লুক, সাপসহ হিংস্র জন্তু জানোয়ারের সাথে লড়াই করে কোন রকমে টিকে থাকা। চা শ্রমিকদের রক্তে আর ঘামে আসামের গভীর জঙ্গল হয়ে উঠলো আজকের সুন্দর চা বাগান। অথচ উন্নত জীবন তো দূরে থাক, চা শ্রমিকদের জীবনে নেমে এলো অন্ধকার। সভ্য দুনিয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে চা শ্রমিকরা পরিণত হলেন নব্য দাসে। এই অবস্থা থেকে চা শ্রমিকরা মুক্তি চাইছিলেন, ঠিক তখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ সমগ্র ভারতবর্ষ। শ্রমিকরা ব্রিটিশদের অত্যাচার ও জীবনের দুর্দশা থেকে মুক্তির জন্য গঙ্গাদয়াল দীক্ষিত ও দেওশরনের নেতৃত্বে প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক পায়ে হেটে মুল্লুকের (নিজ ভূমিতে) উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। অবশেষে ২০শে মে চাঁদপুরের মেঘনা ঘাটে পৌছায়। মেঘনা ঘাটে স্টিমারে উঠতে চাইলে ব্রিটিশ সরকার ও মালিকদের লেলিয়ে দেয়া গোর্খা বাহিনী নির্বিচারে গুলি করে অসংখ্য চা শ্রমিকদের হত্যা করে। লাশ যাতে দেখতে না পারে তার জন্য রাতের অন্ধকারে পেট কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এই জঘন্য হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে গঙ্গাদয়াল দীক্ষিত জেলখানায় অনশন করে মৃত্যুবরণ করেন। অবশেষে রয়েল কমিশন গঠন করে চা শ্রমিকদের গিরমিট প্রথা বাতিল করা হয় এবং কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাগানে ফিরিয়ে আনা হয়। সেই হত্যাকান্ডের সরকারি কোন তদন্ত হয়নি। ঠিক কতজন সেদিন মারা গিয়েছিল তারও হিসাব পাওয়া যায়নি। চা শ্রমিকদের রক্তে তৈরি হলো নতুন ইতিহাস, আমরা সেই সংগ্রামী চা শ্রমিকদের উত্তরসূরি। আমরা ২০০৮ সাল থেকে ২০ মে 'চা শ্রমিক দিবস' হিসেবে পালন করে আসছি। মালিকরা আমাদের লড়াইয়ের ইতিহাস থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে চায়, শিকড়হীন করতে চায়। তাই আমরা ২০শে মে 'চা শ্রমিক দিবস'-কে বাগানের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে চাই, তার চেতনায় দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চাই। গত ১০বছর ধরে আমাদের নিরলস প্রচেষ্টায় 'চা শ্রমিক দিবস' এর বার্তা চা শ্রমিকদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে।

মধ্যম আয়ের দেশে স্বীকৃতি পেতে চলেছে বাংলাদেশ। সেখানে চা-শ্রমিকরা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। ৫০ টাকা যেখানে চালের কেজি সেখানে ৮৫ টাকা দৈনিক মজুরীতে অর্ধাহারে, অনাহারে জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। ওজনে ঠকানো, ঠিকা পাতির জন্যে দ্বিগুণ মজুরি না দেয়া বাগানগুলিতে প্রায় রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। শত শত বছর ধরে চা-শ্রমিকরা বসবাস করলেও তিন পুরুষের ভিটায় কোন আইনি অধিকার নেই। বিভিন্নভাবে চলছে চা বাগান উচ্ছেদের প্রক্রিয়া। চা বাগানে শিক্ষার বেহাল অবস্থা আজ সর্বজন বিদিত, অথচ এব্যাপারে রাষ্ট্রীয় কোন উদ্যোগ নেই। সবার জন্য শিক্ষা স্লোগান তুলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি সমগ্র দেশে পরিচালনা করলেও ১৬৩টি চা বাগানের মধ্যে মাত্র ১০/১৪টিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। চিকিৎসার অভাবে অল্পতেই শরীরে বাসা বাঁধে নানা জটিল রোগ। চা বাগানের নারী শ্রমিকরা আছেন প্রচন্ড স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে। মাতৃত্বকালীন ছুটি নামে মাত্র কার্যকর, বেশিরভাগ বাগানেই একজনও এমবিবিএস ডাক্তার এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মিড-ওয়াইফ নেই। স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের অভাবে কৃমির আক্রমণে রক্তশূন্যতায় ভোগেন প্রায় প্রত্যেক চা শ্রমিক। ৮/১২ হাতের খুপড়িতে স্বামী সন্তান, হাঁস, মুরগী নিয়ে কোন রকমে বসবাস করেন চা শ্রমিকরা। দুই বছর পর পর দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে চা শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়নের জন্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র বাস্তবায়ন করার কথা, অথচ গত ১০ বছরে মজুরি বেড়েছে মাত্র ৫৩টাকা! তারপর এই চুক্তির মধ্যেই যে সুযোগ সুবিধাটুকু থাকে তাও বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এমনকি বর্তমানে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৬ মাস অতিক্রান্ত, কিন্তু নতুন চুক্তি সম্পাদনে টালবাহানা চলছে। ইউনিয়নের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্যে প্রতি বাগানে ইউনিয়ন অফিস ও সুবিধাজনক স্থানে ভ্যালি অফিস নির্মাণ এখন সময়ের দাবি। নিরাপদ পানীয় জল, সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা, পরিচয়পত্র, নিয়োগপত্র, সার্ভিসবুক, গ্র্যাচুয়িটি, গ্রুপ বীমা ইত্যাদি শ্রম আইনের নির্দেশনা মালিকরা কোথাও কার্যকর করছে না। মালিকদের সীমাহীন লুটপাটে বন্ধপ্রায় বাগানগুলোতে শ্রমিকদের করুণ অবস্থা এবং চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া বাগানে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর যেন কেউ নেই। সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। গত দেড় শতাধিক বছরের অধিক সময়ে শাসকের পরিবর্তন হয়েছে, পরিবর্তন এসেছে রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে, কিন্তু চা শ্রমিকের জীবনে কোন পরিবর্তন হয়নি। কারণ পুরাতন শোষকের জায়গায় নতুন শোষক স্থান করে নিয়েছে। চা শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে মালিক শ্রেণী। কোন কালেই অধিকার কেউ কাউকে দেয়নি, চা শ্রমিকদেরও দেবে না। তাই আন্দোলন-সংগ্রাম ও লড়াই করে চা শ্রমিকদের অধিকার আদায় করে নিতে হবে।

শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের ৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

গত ৮ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন এর ৫ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা, সিলেট, রংপুর, চাঁদপুরসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়।

রংপুরে লালবাগ রেলওয়ে বস্তি উচ্ছেদ বন্ধের দাবিতে আন্দোলন

রংপুর নগরীর লালবাগ রেলওয়ে বস্তির ভূমিহীন পরিবারসমূহকে সরকারী খাস জমিতে পুনর্বাসনের দাবিতে ৮ জুলাই বেলা ১.৩০টায় বস্তিবাসীর পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাসদ(মার্কসবাদী) জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, পলাশ কান্তি নাগ,বস্তি রক্ষা সংগ্রাম কমিটির সভাপতি আবু তালেব, সাধারণ সম্পাদক নুর আলম, সদস্য সাজু মিয়া, তানজু বেগম প্রমুখ। স্মারকলিপিতে সরকারী খাস জমিতে বস্তির ভূমিহীন পরিবারসমূহকে পুনর্বাসনের দাবি জানানো হয়। উল্লেখ্য,স্মারকলিপির সাথে খাস জমিতে পুনর্বাসনের জন্য ৯৫টি পরিবারের নামের তালিকা দেওয়া হয়। এর আগে ২৪ জুন পুনর্বাসন ব্যতীত লালবাগ রেলওয়ে বস্তি উচ্ছেদের নোটিশের প্রতিবাদে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও করে বস্তিবাসী। এছাড়া ২৭ জুন বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে লালমনিরহাট এবং জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

সোলার প্ল্যান্ট নির্মাণের নামে ভূমি দখলের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

বেক্সিমকো কোম্পানী কর্তৃক সুন্দরগঞ্জ উপজেলার চরখোর্দ্দা ও লাঠশালায় সোলার প্ল্যান্ট নির্মাণের নামে বাস্তুভিটা ও তিন ফসলী জমি ধ্বংস করার প্রতিবাদে ২৫ জুন গাইবান্ধা শহরে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল পূর্ব সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাস্তুভিটা ও আবাদি জমি রক্ষা সংগ্রাম কমিটির সদ্য কারামুক্ত উপদেষ্টা বীরেন চন্দ্র শীল, বাসদ(মার্কসবাদী) জেলা আহ্বায়ক আহসানুল হাবিব সাঈদ প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ জোরপূর্বক বেআইনীভাবে তিন ফসলী জমিতে সোলার প্ল্যান্ট নির্মাণের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং অবিলম্বে কার্যকর প্রশাসনিক উদ্যোগ দাবি করেন।

‘পিইসি পরীক্ষা বাতিল ও প্রশ্ন ফাঁস রোধে করণীয়’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ব্যারিষ্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বলেন, “স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি এদেশে কোনো গণতান্ত্রিক সরকার ছিল না। স্বৈরাচারী শাসকরা শোষণ-জুলুমকে আড়াল করতে ভবিষ্যত দৃষ্টিহীন প্রজন্ম তৈরি করছে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। প্রতিবাদ, অন্যায় এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো বন্ধ করতেই প্রশ্নফাঁস করছে।” মোশাহিদা সুলতানা বলেন, “পিইসি পরীক্ষা কোমলমতি শিশুদের শৈশবকে ধ্বংস করছে। ফলে এই পরীক্ষা বাতিলের দাবি যথার্থ। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বাজেটে যে বরাদ্দ দেয়া হয় তার অধিকাংশই ব্যয় হয় অবকাঠামো খাতে। প্রাথমিক মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতন খুব কম। তাদের বেতন বাড়ানো প্রয়োজন। অন্যদিকে শিক্ষার নৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করা হচ্ছে। শিক্ষা সম্পূর্ণ সার্টিফিকেটমুখী হয়ে পড়েছে।’

অভিভাবক দিলারা চৌধুরী বলেন, ‘একজন মা কতটা অসহায় হলে প্রতিবাদী হয়। স্কুলেতো আজ শিক্ষা দেয়া হয় না, ব্যবসা হচ্ছে। স্কুলে পড়ানো হচ্ছে না বলে বাধ্য হয়ে কোচিং-এ দেই। বারবার সিলেবাস পরিবর্তন করা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তগুলো নেবার আগে তো একবার বাচ্চাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবা দরকার। কোচিং, পরীক্ষার চাপ সবসময় - এটা শিশুর জীবন নাকি কারাগার।’

বক্তারা আরো বলেন, পিইসি পরীক্ষা চালুর ফলে প্রাথমিক শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ নতুন মাত্রা পেয়েছে। প্রাইভেট ও কোচিং ব্যবসা বেড়েছে। সাথে সথে বেড়েছে ‘পাঠ্যবই সহায়ক পুস্তিকার’ নামে গাইড বই এর ব্যবসা। এই পরীক্ষার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের উপর। শিক্ষকরা স্কুলের কোচিং-এ যেতে বাধ্য করছে ছাত্রদের। আবার নিজের কাছে বাসায় গিয়ে পড়তে যেতেও নানা ভাবে চাপ দিচ্ছে। সৃজনশীল প্রশ্ন করার ফলে শিক্ষকরা নানা রকমের প্রশ্ন পরীক্ষায় দেবার সুযোগ পাচ্ছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় রকমের কঠিন প্রশ্নও স্কুলের পরীক্ষায় দেওয়া হচ্ছে যাতে তার কাছে প্রাইভেটে পড়তে বাধ্য হয়। শুধু শিশুদের নয়, এই পরীক্ষা অভিভাবকদেরও এক অসুস্থ প্রতিযোগিতার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। প্রতি বছর পরীক্ষায় হাজার হাজার শিক্ষার্থী ‘এ প্লাস’ পাচ্ছে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে। ছাত্রদের শুধুমাত্র কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের উত্তর করার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। কিন্তু গণিত, বিজ্ঞান, বাংলা ও ইংরেজী ভাষার ব্যাকরণের মৌলিক বিষয়গুলোই চর্চার বাইরে থেকে যাচ্ছে। এর প্রভাব ছাত্রদের পরবর্তী শিক্ষা জীবনে পড়ছে। ৫ম শ্রেণির একটা শিশুর পরীক্ষাভীতি তৈরি করে তাকে দিয়ে পড়ানো যায়- একথা সত্য। কিন্তু এই পরীক্ষাভীতি তার পড়াশোনার প্রতি আগ্রহের জায়গাকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে তার স্বাভাবিক শেখার প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে থাকে। তাই বক্তাগণ এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

গাইবান্ধায় ছাত্র ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের ওপর ছাত্রলীগের হামলা

গত ১১ জুলাই দুপুর ১২টায় গাইবান্ধা সরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণির নবীন শিক্ষার্থীদের আগমনে শুভেচ্ছা জানিয়ে মিছিল ও সমাবেশ করে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কলেজ শাখা। সমাবেশ শেষে ছাত্র ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ ক্যাম্পাসে অবস্থানকালে আওয়ামী ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী কায়দায় অতর্কিত হামলা করে। হামলায় গুরুতর আহত হয়ে গাইবান্ধা সরকারি কলেজ ছাত্র ফ্রন্ট সভাপতি মাহবুব আলম মিলন, জেলা অর্থ সম্পাদক মাসুদ আকতার, সংগঠক নাজমুল ইসলাম জয় সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়। এই হামলার প্রতিবাদে ওইদিন সন্ধ্যায় সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট জেলা শাখা শহরে এক প্রতিবাদ মিছিল বের করে। সেই মিছিলে আবারও ছাত্রলীগ জয়বাংলা স্লোগান দিয়ে আক্রমণ করে। আক্রমণে আহত হয়ে জেলা ছাত্র ফ্রন্ট সাধারণ সম্পাদক পরমানন্দ দাস, সহ-সভাপতি রাহেলো সিদ্দিকা সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়। আহত অন্যান্যরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছে। উক্ত বর্বরোচিত হামলার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন জেলা বাসদ(মার্কসবাদী) আহবায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ, সদস্য সচিব মঞ্জুর আলম মিঠু, সিপিবি জেলা সভাপতি মিহির ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, ছাত্র ফ্রন্ট জেলা সভাপতি শামীম আরা মিনা, প্রগতিশীল ছাত্রজোটের জেলা সভাপতি তপন চন্দ্র দেবনাথ, সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবি প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ সারাদেশে ছাত্র-ছাত্রীদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্রলীগ এবং পুলিশের ফ্যাসিবাদী আক্রমণে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সেইসাথে গাইবান্ধায় হামলাকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র’র প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত

বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের প্রথম কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সভা গত ২৯ ও ৩০ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকসুর দ্বিতীয় তলায় অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সংগঠক ইভা মজুমদার। প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা, গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, বরিশাল, জয়পুরহাটসহ দেশের দশটি জেলার প্রতিনিধিবৃন্দ। প্রতিনিধিরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেশের বিভিন্ন জেলায় বিজ্ঞানশিক্ষার বাস্তব পরিস্থিতি ও সেখানে সংগঠনের করণীয় তুলে ধরেন। এছাড়া, প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসকরণ ও পিছনের বিজ্ঞান, গণিত ও পদার্থবিদ্যার ব্যবহারিক শিক্ষা নিয়ে প্রশিক্ষণমূলক ক্লাস নেন বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের সংগঠক শুভ সাহা ও অতনু মুখার্জী। সভায় আশু কর্মসূচি হিসেবে মহান বিজ্ঞানী মাদাম কুরীর মৃত্যুবার্ষিকী পালন, বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার ১২৫তম জন্মবর্ষ পালন এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানশিক্ষায় প্রশিক্ষণ ও কুইজ নিয়ে স্কুল কলেজে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সৌদি আরবে অভিবাসী নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা দাও

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন ও বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ২৯ জুন বিকাল ৫টায় প্রেসক্লাবের সামনে অভিবাসী নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সীমা দত্তর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মানস নন্দী, রাজু আহমেদ, তসলিমা আক্তার বিউটি।

সমাবেশে বক্তারা বলেন গত ত্রিশ বছরে সাত লক্ষেরও বেশি নারী শ্রমিক হিসাবে মধ্যপ্রাচ্য পাড়ি দিয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গেছে সৌদি আরবে। শুরু থেকেই এই সকল নারীরা সেখানে নানা ধরনের নিপীড়নের শিকার হয়েছে। বেতন না পাওয়া, মার ধর করা, আগুনের ছ্যাঁকা দেওয়া, নাকে এরোসল স্প্রে করা এই সব নিত্ত নৈমিত্তিক ঘটনা। সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় সেখানে নারীরা যৌন নির্যাতনেরও শিকার হচ্ছে। নির্যাতিতরা দেশে ফিরে এসেও সামাজিক চাপের শিকার হয়েছে। অনেকে পরিবারে ঠাঁই পায়নি। এই সকল অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছে উপস্থাপন করা হলেও তারা দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে। জানা গেছে দায়সারাভাবে যথাযথভাবে প্রস্তুতি না নিয়ে মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে হাজার হাজার অসহায় নারীকে সরকার বিভিন্ন এজেন্সীর মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠিয়েছে। সেখানে গিয়ে তারা যখন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তখন সরকারের পক্ষ থেকেও বলা হচ্ছে এ সকল বানোয়াট গল্প। ঘটে যাওয়া সকল ঘটনার বিষয়ে সরকারকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ

মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার পৃত্তিম পাশা ইউনিয়নের গনকিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ঝিলের পাড় গজবাগ এলাকায় বাসদ (মার্কসবাদী) মৌলভীবাজার জেলার পক্ষ থেকে ১২০টি বন্যা কবলিত পরিবারের মধ্যে ৫ কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়। ত্রাণ বিতরণের পূর্বে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ(মার্কসবাদী) সিলেট জেলা শাখার আহবায়ক উজ্জল রায়, মনু মডেল কলেজের প্রভাষক নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন কুলাউড়া উপজেলা সংসদের সভাপতি ফয়জুল হক, বাসদ (মার্কসবাদী) মৌলভীবাজার জেলার শাখার সংগঠক অনিক চন্দ, কুলাউড়া উপজেলার সংগঠক প্রশান্ত দেব ছানা। উপস্থিত ছিলেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের মৌলভীবাজার জেলা শাখার অনিক দে, সৌরভ রায়, যুবরাজ, আবদুল আজিজ এবং রবির বাজার সুকান্ত সংসদের সংগঠক অমিত দেব, রাজিব উদ্দিন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংকট

লেখক হুমায়ুন আজাদ 'সবুজ পাহাড়ে হিংসার ঝর্ণাধারা বইতে লিখেছেন, "বাঙ্গালাদেশের এক রূপময় খন্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম, তিন দশক ধরে আহত অসুস্থ"। এই বইটি যখন লিখেছিলেন তখন পাহাড় ছিল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধরত। রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনী বনাম পাহাড়ী মুক্তিকামী জনতা। সে লড়াই থেমে গেছে। চুক্তি হয়েছে। দুই দশক পার হলেও চুক্তি বাস্তবায়ন হয়নি। সেই সাথে লড়াই এখন নতুন রূপে, নতুন মাত্রায় গতি পেয়েছে। পাহাড়ি জনগণের প্রত্যাশার শান্তি তো মেলেনি। আঞ্চলিক রাজনীতি এবং বিশেষ সেনা ব্যবস্থার দ্বন্দ্বে দুঃসহ যন্ত্রণায় পতিত পাহাড়ি খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের জীবন।

গত কয়েক মাসে পাহাড়ে আঞ্চলিক রাজনৈতিক কোন্দলে গুম, খুন, হত্যা, অপহরণ নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। গত পাঁচ মাসে কমপক্ষে ১৮ জন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছে। রাজনৈতিক অপহরণ, গুম মামুলি ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। সর্বশেষ নানিয়ারচর উপজেলা চেয়ারম্যান শক্তিমান চাকমা হত্যা এবং তাঁর শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যাওয়ার পথে ৬ জন হত্যাকান্ডের ঘটনাটি সর্বমহলে আতঙ্কের জন্ম দিয়েছে। তার পূর্বে মিঠুন চাকমা হত্যাকান্ড, নারী নেত্রী অপহরণ জনমনে সংঘর্ষের দুশ্চিন্তাকে শক্তিশালী করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে চারটি আঞ্চলিক সংগঠন রয়েছে। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তির বিরোধিতা করে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ১৯৯৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর প্রসিত খীসার নেতৃত্বে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) গঠন করা হয়।

এছাড়া ২০০৭ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রাজনৈতিক চাপে জনসংহতি সমিতিতে সংস্কার আসে। গড়ে উঠে জনসংহতি (এম এন লারমা)। বদলে যায় রাজনৈতিক হিসাব। গত ২০ বছরে জনসংহতি সমিতি ও ইউপিডিএফ-এর এলাকা নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই দলের কোন্দলের কারণে বহু নেতা-কর্মী নিহত হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশ তাদের দলীয় মতবিরোধে ১ হাজার খুন আর ১৫শ' গুম হয়। ২০১৬ সালে দুই দলের মধ্যে অলিখিত ও অপ্রকাশ্য সমঝোতায় সশস্ত্র সংঘাত থামলে কিছুটা স্বস্তি আসে পাহাড়িদের মনে।

২০১৭ সালে ভাঙে প্রসিত খীসার ইউপিডিএফ। তপন জ্যোতি চাকমার নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক), যা সংঘাতে নতুন মাত্রা দেয়। দৃশ্যত চারভাগে বিভক্ত হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক রাজনীতি। আবার এ দলগুলোর আছে আওয়ামী লীগ, বিএনপি সহ জাতীয় বড় দলগুলোর সাথে স্বার্থকেন্দ্রিক যুক্ততা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির সভাপতি গৌতম দেওয়ান এক বিবৃতিতে বলেন, "আমরা অনেকদিন ধরেই লক্ষ্য করছিলাম পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। আমরা যেহেতু বুঝতে পারছিলাম, আমার মনে হয় প্রশাসনও বুঝতে পেরেছে। অথচ তারা কোন ব্যবস্থা নেয়নি।" তিনি বলেন, তারা যদি আগে থেকে ব্যবস্থা নিত তাহলে এই ধরণের খুনোখুনি থামানো যেতো বলেই আমি মনে করি। এখানে চারটি গ্রুপ সক্রিয়। তারা নিজের আধিপত্য ধরে রাখতে তৎপরতা চালাচ্ছে। এর সঙ্গে সামনে নির্বাচন একটা বড় কারণ। আর শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়া আরো বড় কারণ। এখনই সমাধানের উদ্যোগ না নিলে পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে"।

পাহাড়ের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী কারা? স্বাধীনতার পর থেকেই রাষ্ট্র সবসময়ই পাহাড়ি জনগণের উপর বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা চালু করেছে। দ্বৈত শাসননীতির কারণে তারা একদিকে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন সহ্য করে। আবার সেই সাথে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে সেনাবাহিনী তাদের উপর চালায় দমন-পীড়ন-নির্যাতন। এ কাজে ব্যবহৃত হয় গরীব সেটেলার বাঙালি। এখানকার জনগণ দীর্ঘদিন ধরেই ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি করে তাদের ভূমি ফিরিয়ে দেবার দাবি করছে। চুক্তি বাস্তবায়ন করে সামাজিক ও প্রশাসনিক অধিকার নিশ্চিতের দাবি জানিয়ে আসছে। জাতিগত বিরোধ, সেনা প্রত্যাহার, ভূমি বিরোধ, সেটেলার সমস্যা নিরসনের কোনো উদ্যোগ রাষ্ট্রের তরফ থেকে নেয়া হয়নি। ২০১২ সালে রাঙ্গামাটিতে, ২০১৩ সালে খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায়, ২০১৪ সালে নানিয়ারচরে বড় ধরনের জাতিগত হামলা হয়েছে। আইনবহির্ভূতভাবে সেনাবাহিনী কর্তৃক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেই চলেছে। যথেচ্ছ গ্রেপ্তার, হয়রানি, সেনা হেফাজতে শারীরিক অত্যাচার ও মৃত্যু প্রতিবছর বাড়ছে। সামরিক কর্মকর্তা ও সেটলারদের ভূমি দখলের ফলে আদিবাসীরা প্রান্তিকতার শেষ প্রান্তে পৌঁছেছে। সেনা-সেটলার কর্তৃক আদিবাসী নারীদের ধর্ষণের পরিসংখ্যান প্রতি বছর বেড়েই চলেছে। অথচ বিচার হয়নি একটি ঘটনারও। আবার পাহাড়ি সংগঠনগুলো প্রতিশোধ নিতে নিরস্ত্র মানুষকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে সরে এসে তারাও সুবিধা, আধিপত্য বিস্তার, চাঁদাবাজিসহ বুর্জোয়া রাজনীতির ধারায় পরিচালিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করছেন এমন একজন বিশেষজ্ঞ আমেনা মহসিন বলেন, পাহাড়ের আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর বিভক্তির প্রধান কারণ আর্থিক, আর সে কারণেই তারা এলাকাভিত্তিক আধিপত্য বাড়াতে চায়। এই অর্থ আদায়কে কেন্দ্র করে অপহরণ, হামলা আর কোন্দলের সুযোগ নেয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এবং জাতীয় দলগুলো। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকারী শক্তির দুর্বলতা, আঞ্চলিক রাজনৈতিক কোন্দল, রাষ্ট্রীয় বৈষম্য এবং অবৈধ সেনাশাসনের দৌরাত্ম্যে পাহাড়ি ও পাহাড়ে বসবাসকারী সকল মানুষের জীবন আতঙ্কগ্রস্ত। প্রয়োজন গণতান্ত্রিক আন্দোলন।

প্রতিবাদ ছাড়া মর্যাদা নিয়ে বাঁচা যায় না

(১ম পৃষ্ঠার পর) আন্দোলনের সৈনিক সূর্য সেন, প্রীতিলতা এমনকি দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়া মুক্তিযোদ্ধাদের নামে সহস্র কটূক্তি করা হয়। সেসবের ব্যাপারে সরকার নীরব থাকেন। অথচ প্রধানমন্ত্রীর নামে কটূক্তির অভিযোগে (সেটাও একটা মিথ্যা অভিযোগ) রিমান্ড পর্যন্ত মঞ্জুর হয়ে যায়।

নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনের নতুন পদ্ধতি

বর্তমানে আওয়ামী লীগ যে প্রক্রিয়ায় নির্বাচন করতে চাইছে সেটা আরও পরিকল্পিত। ৫ জানুয়ারির মতো একেবারে খোলামেলা রিগিং নয়। এবার সব দলকে নির্বাচনে এনে বিভিন্ন কৌশলে নির্বাচনকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রেখে নিজেদের প্রার্থীকে জয়ী করা হচ্ছে। 'সুজন' এর সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বর্তমানের নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন নিয়ে পত্রিকায় একটি লেখা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, এই নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনের ৫টি বৈশিষ্ট্য। এক. নির্বাচনের আগে বিরোধী প্রার্থীর নেতাকর্মীদের রীতিমত তাড়িয়ে বেড়ানো। হঠাৎ করে মামলা দেয়া, ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করা – এতে তারা আর নির্বাচনের কাজে অংশ নিতে পারে না। দুই. পোলিং এজেন্টদের দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়া। পোলিং এজেন্টদের ভয় দেখিয়ে, মামলা দিয়ে, জোরপূর্বক এলাকাছাড়া করাই শুধু নয়; এবারের গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটালো সরকার। প্রায় ১০০ পোলিং এজেন্টকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে রাতে ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানে ছেড়ে দিয়ে আসা হল। তিন. নির্বাচনে বলপ্রয়োগ। বুথ দখলে নিয়ে ইচ্ছেমত ভোট দেয়া এই নির্বাচনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। যেহেতু পোলিং এজেন্ট নেই, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিজেদের দখলে, তাই এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে ভোটের ব্যবধান ব্যাপক হারে বাড়িয়ে তোলা হয়। গাজীপুরের নির্বাচনের দিকে তাকালে আমরা দেখব যে, যেসব কেন্দ্রে ভোট পড়ার হার শতকরা ২০-৩০ শতাংশ, সেখানে আওয়ামী লীগ প্রার্থী বিএনপি প্রার্থীর চেয়ে শতকরা ৩৩ শতাংশ ভোট বেশি পেয়েছেন; যেখানে ভোট পড়ার হার ৩০-৫০ শতাংশ, সেখানে ৫১ শতাংশ বেশি পেয়েছেন; যেখানে ভোট পড়ার হার ৫০-৬০ শতাংশ, সেখানে ৮৯ শতাংশ বেশি পেয়েছেন; যেখানে ৬০-৮০ শতাংশ, সেখানে ১৫৮ শতাংশ বেশি পেয়েছেন। যেখানে ভোট পড়ার হার ৯০ শতাংশের উপরে সেখানে ৩০৯ শতাংশ বেশি পেয়েছেন। বিজয়ী ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারীর ভোটের অনুপাত সবচেয়ে কম ভোট পড়া কেন্দ্রগুলিতে ১০০:১৩৩, আর সবচেয়ে বেশি ভোট পড়া কেন্দ্রগুলিতে ১০০:৪০৯। অর্থাৎ যেসব কেন্দ্র বেশি ভোট পড়েছে তা কেন পড়েছে সেটা আমরা সহজেই এই হিসাব থেকে বুঝতে পারি। চতুর্থত. নির্বাচন কমিশনের নিষ্ক্রিয়তা। নির্বাচনের সময় পুরো প্রশাসন কমিশনের দায়িত্বে থাকলেও তারা কোন ভূমিকাই নেয়নি। এ থেকে বোঝাই যায় পরবর্তী নির্বাচনে তাদের ভূমিকা কী হবে। পঞ্চমত. স্থানীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, মেয়রদের বহিস্কার করে, মামলা দিয়ে, জেলে পুরে, তাদের কাজের অর্থ বরাদ্দ না করে এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে যে, গতবারের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিরোধীদলীয় প্রার্থী যারা জয়ী হয়েছিলেন, তাদের নির্বাচনী এলাকার বেহাল দশা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণা হয়েছে যে, সরকারদলীয় প্রার্থী বিজয়ী না হলে এলাকার কোন উন্নয়ন হবে না।

এই নির্বাচনী পরিকল্পনা নিয়েই আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তাদের অধীনে করতে চাইছে। এর থেকে কোনরকম বিচ্যুতি তাদের কাম্য নয়।

খালেদা জিয়াকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার ও বিভিন্ন ইস্যু সামনে এনে বিষয়টিকে ধামাচাপা দেয়া

খালেদা জিয়া ও তার দল রাষ্ট্র পরিচালনা, দুর্নীতি, নির্যাতন, নিপীড়নের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের থেকে ভিন্ন কিছু নয়। কিন্তু এ সময়ে তাকে গ্রেফতার করে জেলে পুরে রাখাটা কোন ন্যায়বিচারের অবস্থান থেকে করা হয়নি। সেটা করা হয়েছে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। এটি পরিকল্পিতভাবে বিরোধী মত ও তার ক্রিয়াকলাপ দমনের লক্ষ্যে একটি পদক্ষেপ। একদিকে খালেদা জিয়ার পূর্বের অগণতান্ত্রিক শাসন, তার সাথে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা ছাড়া তার দলের দিক থেকে জনগণের পক্ষে কোন আন্দোলন না থাকায় মানুষের মধ্যে এ ঘটনা নিয়ে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া হয়নি, কিন্তু এটি গণতন্ত্রের জন্য একটি অশনি সংকেত। একটা বিরোধী দলের সংগঠনকে সম্পূর্ণ ছারখার করে দিয়ে তাকে বিভক্ত করা কিংবা একেবারে দমন করার যে ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ সরকার নিচ্ছে তা তার ফ্যাসিবাদী চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ। বিএনপিও তার শাসনামলে এই কাজ করেছিল। শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছিল বিএনপি-র একাংশ এবং তার অনেকটাই বাস্তবায়ন করতে পেরেছিল। বুর্জোয়া রাজনীতির এই ষড়যন্ত্র ও সংঘাতমূলক পদক্ষেপ এটাই শেখায় যে, তাদের রাজনীতিতে মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার কিছুই আজ আর অবশিষ্ট নেই। আবার সরকার একের পর এক যেসব দমনমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে তাতে পরবর্তী ঘটনা পূর্বের ঘটনা থেকে আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করার কারণে পূর্বের ঘটনা চাপা পড়ে যাচ্ছে। মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে, কিন্তু কোন একটা ইস্যুকে কেন্দ্র করে সুনির্দিষ্ট ও ধারাবাহিক আন্দোলন দানা বাঁধছে না।

বামপন্থীদেরই দাঁড়াতে হবে আন্দোলনের পথে, নির্বাচনী চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই

দেশে বামপন্থীদের দুটি জোট সিপিবি-বাসদ ও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা এখনও কার্যকর কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। সবচেয়ে বড় দল সিপিবি দ্বি-দলীয় ধারার বাইরে বাম বিকল্পের শ্লোগান দিলেও তাদের নেতারা মাঝে-মধ্যেই আওয়ামী লীগের সাথে বিভিন্ন ফোরামে ওঠা-বসা করেন। এসব জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি করে। বাসদ বেশ কিছুদিন নাগরিক ঐক্য, কৃষক-শ্রমিক-জনতা লীগ, বিকল্প ধারা, গণফোরাম ইত্যাদি দলের পেছনে অনেক ঘোরাঘুরি করেছে বামপন্থীদের সাথে এদের একটা ঐক্য তৈরি করার জন্য, যাতে নির্বাচনে একটা শক্তপোক্ত অবস্থান দেখানো যায়। তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বাম মোর্চার বেশ কিছু দলও তাদের সাথে সহমত পোষণ করতেন। কোন একটি আসনে এই বামপন্থীদের কাউকে মানুষ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে এই অবস্থা নেই। বামপন্থীদের মানুষের সামনে আসতে হলে আসতে হবে গণআন্দোলন দিয়ে। কিন্তু ধারাবাহিক গণআন্দোলনের দিকে বেশিরভাগেরই মনোযোগ ও উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। সাংগঠনিক শক্তিরও সীমাবদ্ধতা আছে। এতকিছুর পরও বামপন্থীরাই একমাত্র রাজনৈতিক শক্তি যারা জনস্বার্থ নিয়ে কিছুটা লড়ছে ও সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। বর্তমানে, বামপন্থীদের মধ্যে একটা ঐক্যের প্রচেষ্টা চলছে। এই সরকারের অধীনে কোন সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন চাই– এই দাবিসহ জনজীবনের জরুরি দাবিতে এই বাম ঐক্য আওয়ামী লীগের স্বৈরতান্ত্রিক দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে – এই প্রত্যাশাই আমরা করি।

শিক্ষিত সচেতন মানুষ প্রত্যেকের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ

দেশের শিক্ষিত সচেতন মানুষ প্রত্যেকেরই এই সময়ে ভূমিকা নেয়া দরকার। কারণ বিপদ সামনে, সময় থাকতেই তাকে প্রতিরোধ করতে হবে। আজ শিক্ষক, ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী, রাজনীতিবিদ, শ্রমিক, কৃষক কেউই অত্যাচার-নিপীড়নের বাইরে নয়। এই ফ্যাসিবাদী শাসনে মানুষের ন্যূনতম অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা – কোন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। এই অন্যায় মেনে নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচাও যাবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক এরই মধ্যে নিজেদের মর্যাদা নিয়ে নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশকিছু শিক্ষক তাদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। এটা এই সময়ে একটা অনন্য দৃষ্টান্ত। এভাবে দেশের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরা যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসেন তবে একটা কার্যকর গণআন্দোলন গড়ে উঠতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগত প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট কাউন্সিলের সভা থেকে গত ৮ জুলাই যে প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে তার কড়া সমালোচনা করে ১০ জুলাই প্রগতিশীল ছাত্র জোটের নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, প্রভোস্ট কাউন্সিলের প্রস্তাবনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেতনার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয় কারো জমিদারি নয়। বিশ্ববিদ্যালয় সর্বসাধারণের সম্পদ, আশা-আকাঙ্ক্ষার বাতিঘর। জনসাধারণের টাকায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়। দেশের জনগণ যেভাবে চাইবেন সেভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হবে। দেশের মানুষকে বহিরাগত আখ্যা দেয়া সুবিবেচনা নয়, শিষ্টাচার বহির্ভূত। নিরাপত্তার অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বসাধারণের চলাফেরা সংকুচিত নয়, বরং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাসী তৎপরতা দূর করতে হবে। নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, অগণতান্ত্রিক নীতিমালা তৈরি করে, নিষেধাজ্ঞা জারি করে মানুষের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ ছাত্রসমাজ সহ্য করবে না।

রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন

রংপুর : চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রংপুর জেলা শাখা রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে গত ৯ মে বুধবার রংপুরের জি. এল. রায় রোডস্থ সংগঠন কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনাসভা শুরুর আগে কবির প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সংগঠনের রংপুর জেলা শাখার ইনচার্জ মনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে ও সদস্য বাবুল হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন কারমাইকেল কলেজের বাংলা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক আতাহার আলী ও বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর জেলা শাখার সদস্য আহসানুল আরেফিন তিতু। আলোচনা শেষে সংগঠনের শিল্পীরা রবীন্দ্রসঙ্গীত, আবৃত্তি ও কবি গানের তালে নৃত্য পরিবেশন করেন।

শেরে বাংলা নগর থানা : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৭ তম জন্মদিবস উপলক্ষে শিশুকিশোর মেলা পাঠাগার, শেরে বাংলা নগর-এর উদ্যোগে ১১ মে বিকাল সাড়ে ৪টায় কবিগুরুর কবিতা-গান-গল্প নিয়ে নানাবিধ আয়োজনের মধ্য দিয়ে তা পালিত হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পাঠাগারের আহবায়ক সায়েরা সরকার সুমী। অনুষ্ঠান সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন পাঠাগারের উপদেষ্টা মর্জিনা খাতুন, স্নেহার্দ্রি রিন্টু, গোলাম রাব্বী, পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান রিয়াদ, শাহেদ ও বৃষ্টি আক্তারসহ পাঠাগারের ক্ষুদে অনেক বন্ধুরা।

ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার লড়াই চলছে, চলবে আরও বহুদিন

এ যেন দুই চোখে দুই জিনিস দেখার মতো ব্যাপার। আপনি এক চোখে যখন গাজায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর স্নাইপারের গুলিতে ৬২ জন ফিলিস্তিনির মৃত্যু, কমপক্ষে তিন হাজার মানুষের রক্তাক্ত আহাজারি আর ধোঁয়া-ধূলা-টিয়ারগ্যাস আর রক্তের হোলিখেলা দেখছেন। ঠিক সেই সময়ে অন্য চোখে দেখবেন – গাজা থেকে মাত্র ৫০ কিলিমিটার দূরে জাকজমকপূর্ণ এক আয়োজনে, শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে, সেলফি তুলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কন্যা ইভাঙ্কা ট্রাম্প আর তার স্বামী জ্যারেড কুশনার জেরুজালেমে নতুন মার্কিন দূতাবাসের উদ্বোধন করছেন। গত ৬ ডিসেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সমস্ত প্রতিবাদ ও আন্তর্জাতিক আইন উপেক্ষা করে জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং তেল আবিব থেকে জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস সরিয়ে নেবার ঘোষণা দেন। ট্রাম্পের ঘোষণার সাথে সাথে রামাল্লা, বেথলেহেম, হেবরনসহ বিভিন্ন শহরে প্রতিবাদ হয়েছে। গাজা উপত্যকাসহ বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদকারীদের সাথে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ হয়েছে। বিক্ষোভ-প্রতিবাদ হয়েছে জর্ডান, তিউনিসিয়া, তুরস্কসহ মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে। তারই একপর্যায়ে গাজার ইজরায়েল সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় প্রায় লক্ষাধিক মানুষের বিক্ষোভ, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী কর্তৃক ৬২ জন ফিলিস্তিন হত্যার ঘটনা ঘটে।

ফিলিস্তিনিরা তাদের নিজ ভূমিতেই পরবাসী। নিজের দেশেই থাকতে হলেও তাদের জীবন দিতে হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এই রক্তাক্ত অধ্যায়টির সূচনা ঘটে আজ থেকে ৭০ বছর আগে। বিশ্বসাম্রাজ্যের মোড়লদের চক্রান্তে, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরব ভূখণ্ডে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৯৪৮ সালে একটি তথাকথিত 'ইহুদি' রাষ্ট্র ইসরায়েলের জন্ম দেয়। সেই একই প্রস্তাব অনুসারে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠারও কথা ছিল। কিন্তু ৭০ বছরে ইসরায়েল বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর দেশ হলেও ফিলিস্তিনিদের স্বাধীন ভূখণ্ড আজও অধরাই রয়ে গেছে।

১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ ফিলিস্তিনকে ভাগ করে দুটি রাষ্ট্র (একটি ইহুদি, অন্যটি আরব) গঠন করার উদ্যোগ নেয়। আরবরা সে সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি। প্রতিবেশী চারটি দেশ মিশর, সিরিয়া, জর্ডান ও ইরাক একযোগে ইসরায়েলকে আক্রমণ করে। যুদ্ধে আরবেরা পরাজিত হয়। ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের জন্য বরাদ্দকৃত জায়গাসহ অবিভক্ত প্যালেস্টাইনের ৭৭ শতাংশ ভূমি দখল করে নেয়। এর বাইরে বাকী অঞ্চলের মধ্যে পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম জর্ডান এবং গাজা মিশরের নিয়ন্ত্রণে থাকে। ১৯৬৭ সালে আরবদের সাথে আরেকটি যুদ্ধ হয় ইসরায়েলের। ছয়দিনের এই যুদ্ধে জর্ডান পরাজিত হয় এবং ইসরায়েল পশ্চিম তীর দখল করে নেয়। গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ ছাড়তে বাধ্য হয় মিশরও।

এরপর ১৯৯৩ সালে সম্পাদিত অসলো চুক্তির মাধ্যমে যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয় তাতে পশ্চিম তীর ও গাজায় নামকাওয়াস্তে ফিলিস্তিনি স্বায়ত্তশাসন কায়েম হয়। ততদিনে অবশ্য এ অঞ্চলের বেশিরভাগ জায়গা ইসরায়েলিদের দখলে চলে গেছে। আজও সেখানে নামেই আছে স্বায়ত্তশাসন। চারপাশে ইসরায়েলের পাহারা, উঁচু দেয়াল। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতেও ইসরায়েলের অনুমতি লাগে।

ইসরায়েল বিশ্বব্যাপী ধিকৃত, কিন্তু তবুও একাজ করার সাহস তারা পেয়েছে এবং পাচ্ছে মার্কিন শাসকদের কারণে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থ, অস্ত্র দিয়ে ইসরায়েলিদের সহায়তা করে আসছে সেই শুরু থেকেই। ফিলিস্তিন স্বাধীন ভূ-খণ্ডের স্বীকৃতিও পায়নি তাদের কারণে। জেরুজালেম শহরকে নিয়ে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহতেও আছে তাদের হাত। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে ইসরায়েল পূর্ব জেরুজালেম দখল করে নিয়েছিল। তখন থেকে এ শহরটিকে রাজধানী হিসেবে ইসরায়েল ঘোষণা করে। ফিলিস্তিনিরা তা মানেনি। বরং স্বাধীন ফিলিস্তিন হলে তার রাজধানী হবে পূর্ব জেরুজালেম – এই তাদের ঘোষণা। বিশ্বের কোনো দেশ ইসরায়েলের রাজধানী হিসাবে জেরুজালেমকে স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় এসে জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী স্বীকৃতি দিয়েছেন। শুধু জেরুজালেম নয়, ৬৭ সালে ইসরাইল যেসব এলাকার দখল নিয়েছিল সেগুলোকে জাতিসংঘসহ বিশ্বসম্প্রদায় এতদিন 'অধিকৃত এলাকা' বলে অভিহিত করে এসেছে এবং সেখান থেকে ইসরাইলকে দখল প্রত্যাহার করতে হবে এই দাবি করে এসেছে। ট্রাম্প এই ঘোষণার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে ইসরাইলের দখলকেই বৈধ স্বীকৃতি দিলেন। অর্থাৎ, দুই রাষ্ট্র সমাধান প্রস্তাব বাতিল করে প্যালেস্টাইন ভূ-খণ্ডে একক রাষ্ট্র থাকবে ইসরাইল – এর পক্ষে মার্কিন সমর্থন ঘোষণা করলেন। এর প্রতিক্রিয়াতেই সাম্প্রতিক বিক্ষোভ এবং তা দমনে নির্মমতা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এমন অপতৎপরতার সাথে জড়িয়ে আছে আরেকটি দেশ, সৌদি আরব। মুসলিম বিশ্বের মোড়ল হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করলেও কেবল ক্ষমতার স্বার্থে ইসরায়েলের সাথে হাত মেলাতে তার বাধে না। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে সৌদি যুবরাজ সালমান নিউইয়র্কের এক অনুষ্ঠানে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে তার অবস্থান ব্যক্ত করেছেন। তিনি আমেরিকান ইহুদি নেতৃবৃন্দকে নিশ্চয়তা দেন যে, 'প্যালেস্টাইন ইস্যু সৌদিদের অগ্রাধিকারে নেই এখন।' আসলে সৌদি আরব আর ইসরায়েল এখন পরস্পর সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ। সৌদি আরব চাইছে ইসরায়েলকে সমর্থন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরও কাছাকাছি যাওয়া এবং ইরানের ওপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থার সহযোগিতা নেয়া। অন্যদিকে ইসরায়েলের চাওয়া হলো ইরানের বিরুদ্ধে তার অবস্থানের পক্ষে সৌদি অর্থায়ন এবং সৌদি আরবের ভূমি ব্যবহার। বলার অপেক্ষা রাখে না, সৌদি আরবের মুখাপেক্ষী মধ্যপ্রাচ্যের আরও কয়েকটি দেশ সৌদি-ইসরায়েল এই অবস্থানের বিরুদ্ধে যাবে না। এ কারণেই ফিলিস্তিনিদের উপর নির্মম অত্যাচারের পরও আমরা প্রতিবেশী দেশগুলোকে নিশ্চুপ দেখতে পাই।

ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি নিপীড়ন যেমন সত্য ঘটনা, তেমনি এই দীর্ঘ সময়ে ফিলিস্তিনি জনগণের বীরত্বপূর্ণ লড়াইও এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এত দমন-পীড়ন-নির্যাতনেও ফিলিস্তিনিরা তাদের মাথা নত করেনি। এই সময়েও একটি ঘটনা এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে। হুইল চেয়ারে বসা, দুই পা নেই এমন একজন ফিলিস্তিনি যুবক আবু সালেহর ইসরায়েলি সেনাদের বিরুদ্ধে গুলতি ছুঁড়ে দেবার ছবি হয়তো অনেকেই দেখেছেন। লড়তে লড়তে জীবন দেয়া এই অকুতোভয় যোদ্ধা বিশ্বের সকল নিপীড়িত-লড়াকু মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। শুধু একজন আবু সালেহ নয়, এমন অসংখ্য যোদ্ধা প্রতিদিন জন্ম নিচ্ছে ফিলিস্তিনে। ইসরায়েলি সেনাদের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে লড়ছে ফিলিস্তিনি শিশু-কিশোর-যুবারা। মাতৃভূমি রক্ষায় তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইসরায়েল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা সৌদি আরব – কোনো অন্যায়ের শক্তি নেই তাদের রুখে দাঁড়াবে। ৭০ বছর ধরে লড়াই চলছে, চলবে আরও বহুদিন। ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার লড়াই বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত চলবে।

'১৫ টাকায় থাকা আর ৩৮ টাকায় খাওয়া'?

হতে পারে হলগুলোর (৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

(শেষ পৃষ্ঠার পর) স্যানিটেশন নিয়ে – যেখানে এক একটা ফ্লোরের দুপাশের ৬/৮ টি বাথরুমে শত শত ছাত্র যাতায়াত করে। দুজনের রুমে ৮ জন গাদাগাদি করে কোনরকমে শুতে পারে, কিন্তু বাথরুমের ক্ষেত্রে সে নিয়ম খাটে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর চিত্র আজ অনেকটা রিফিউজি ক্যাম্পের মতো। দেশের যারা ভবিষ্যৎ, যারা চিন্তা করবে, লিখবে, পথ দেখাবে, নেতৃত্ব দেবে, সাহিত্যিক-শিল্পী-বিজ্ঞানী-শিক্ষক-প্রশাসক হবে তাদের প্রতিদিনের জীবনযাপন চলে এই যুদ্ধের মধ্যে। এই যুদ্ধ চিন্তা করার কোন অবসর রাখে কি? এই ভাবনাই সে প্রতিনিয়ত তৈরি করতে থাকে যে, কবে দুটো পয়সা রোজগার করব, একটু ভাল থাকব, এই দুঃসহ জীবন থেকে মুক্তি পাব।

ছাত্রদের জন্য নতুন হল, ক্যান্টিনে ভর্তুকি, বৃত্তির ব্যবস্থা করা – সরকারের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগগুলো নেয়া প্রয়োজন। না হলে উচ্চশিক্ষা রক্ষা পাবে না। উচ্চশিক্ষা রক্ষা না পেলে সুশিক্ষিত ও দক্ষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টি হবে না। কিন্তু ঘটছে তার বিপরীত। ২০০৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন 'উচ্চশিক্ষার ২০ বছর মেয়াদী কৌশলপত্র' গ্রহণ করেছে। তাতে স্পষ্ট বলা আছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ধীরে ধীরে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে হবে। রাষ্ট্র তার বরাদ্দ একসময় তুলে নেবে। ২০০৬ সালের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির উপর প্রবল জোর দেয়া শুরু হল। ফলশ্রুতিতে প্রতি বছর ছাত্রবেতন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। চলতি ছাত্রদের বেতন বেশি বাড়ালে আন্দোলন হয়। তাই এখন ব্যাপকহারে বৃদ্ধিটা করা হয় যখন ছাত্ররা প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়। বেতন ফি বাড়ানো, হল-হোস্টেল থেকে সবরকম ভর্তুকি প্রত্যাহার, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগুলো ভাড়া দেয়া, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নাইট কোর্স – এসবের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ আয় বাড়ানো হচ্ছে। তার ফলে শিক্ষাব্যয় এখন প্রতিবছর বাড়ছে। ছাত্রদের অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে।

সম্প্রতি মন্ত্রী-এমপি-আমলাদের মোবাইল ফোন কেনার জন্য বরাদ্দ ১৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। তাদের মোবাইল বিলের ক্ষেত্রে কোন সীমা থাকবে না, মাসে যত টাকা খরচ করবেন তত টাকাই রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে পরিশোধ করা হবে। গত ৮ বছরে সরকার ১১০০০ হাজার কোটি টাকা লোকসানে পড়া রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোকে দিয়েছে। ব্যাংকগুলো থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা সরানো হয়েছে, যারা সরিয়েছেন তারা সবার সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাদের চুরির টাকা জনগণের ট্যাক্সের টাকা থেকে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দ কমানো হচ্ছে। 'ছাত্রদের বেতন এত কম থাকতে পারে না, এটাকে বাড়াতে হবে' এই মত জোরালোভাবে প্রচার করা হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, ছাত্ররা মোবাইলের পেছনে অনেক বেশি টাকা খরচ করে (যদিও বরাদ্দ তারাই পান)। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন 'পিবিএফ' (পারফরমেন্স বেইজড ফান্ডিং) চালু করতে হবে। অর্থাৎ বক্তব্য পরিস্কার, এত সুবিধা ছাত্রদের দেয়া যায় না।

একদিকে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর জীবন, অন্যদিকে গুটিকয়েক ব্যবসায়ী-লুটপাটকারী – রাষ্ট্র কাকে তার ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্ব দিচ্ছে? রাষ্ট্রটা কার? সে কী চাইছে? দেশের উন্নয়ন বলে যারা গলা ফাটিয়ে দিচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্য কী?

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে এখন একটি জনপ্রিয় বাক্য হচ্ছে 'আমি রাজনীতি পছন্দ করি না।' রাষ্ট্রের টাকা কোথায় যায়, কাকে দেয়া হয়, আমাদের শিক্ষাজীবনের এই অবস্থা কেন – এই প্রশ্নগুলো সরাসরি রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত। পরিত্রাণের রাস্তাও রাজনৈতিক। দেশটা একটা শ্রেণী চালায় ও তাদের স্বার্থেই সবরকম বরাদ্দ-বন্টন, আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ হয়। ছাত্ররা এই সত্য না বুঝলে, বুঝে লড়াই না করলে তাদের মুক্তি নেই, পরিত্রাণ নেই। দাসের মতো অমানবিকভাবে উচ্চশিক্ষা জীবন কাটালে বুদ্ধিবৃত্তি কিংবা আত্মমর্যাদাবোধ কোনকিছুরই বিকাশ ঘটে না। বরং ছোটবেলায় পারিবারিকভাবে গড়ে ওঠা নৈতিকতা ও মূল্যবোধের স্তর আরও নিচে নেমে যাবে। একটা জাতির জন্য এর চেয়ে সংকটের আর কিছু হতে পারে না।

ধানসহ কৃষি ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার দাবিতে সমাবেশ ও মিছিল

ধানসহ কৃষি ফসলের লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করা এবং হাটে হাটে ক্রয়কেন্দ্র খুলে সরাসরি প্রকৃত কৃষকদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত দামে ধান কেনার দাবিতে কেন্দ্রঘোষিত দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(মার্কসবাদী)-এর উদ্যোগে ২৫মে বিকাল ৫টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে সমাবেশ ও পরবর্তীতে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য মানস নন্দী, জহিরুল ইসলাম, ফখরুদ্দিন কবির আতিক, সাইফুজ্জামান সাকন।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, "এ বছর সরকারিভাবে প্রতি মণ ধান এক হাজার ৪০ টাকা ও চাল এক হাজার ৫২০ টাকা (প্রতিকেজি ধানের দাম ২৬ টাকা ও চালের কেজি ৩৮ টাকা) নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারিভাবে ২ মে থেকে সারাদেশে কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ধান-চাল সংগ্রহ অভিযান শুরুর কথা থাকলেও মন্ত্রণালয় থেকে পরিপত্র ইস্যু না করায় ১৭/১৮ মে-র আগে কোথাও তা শুরু হয়নি। এরপরও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিসগুলো প্রধানত মিলারদের কাছ থেকে চাল কিনছে, ধান কেনা এখনো শুরু করেনি। ফলে বোরো ধানের বাম্পার ফলন ফলিয়ে লাভজনক মূল্য পাচ্ছে না চাষীরা। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে কম দামে ধান-চাল বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন কৃষক। অধিকাংশ স্থানে কাঁচা ধান বাজারে সাড়ে ৪শ-৫শ টাকা *(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

'পিইসি পরীক্ষা বাতিল ও প্রশ্ন ফাঁস রোধে করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল

সমাজতান্ত্রিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে পিইসি পরীক্ষা বাতিল ও প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে করণীয় বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠক গত ৯ জুন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি ভবনের সাগর-রুনি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টুর সঞ্চালনায় গোলটেবিল বৈঠকে বক্তব্য রাখেন ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোশাহিদা সুলতানা ঋতু, ঝিগাতলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ইসহাক সরকার, শিশু ও শিক্ষা রক্ষা আন্দোলনের আহ্বায়ক লেখক রাখাল রাহা, প্রযুক্তিবিদ দিদারুল ভুইয়া, স্বপ্নগর বিদ্যানিকেতনের সমন্বয়কারী ধ্রুব জ্যোতি হোড়, নারায়ণগঞ্জ বেইলি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মঞ্জুরুল হক, ভিকারুন্নেসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের অভিভাবক দিলারা চৌধুরী, শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতি পাঠাগারের সভাপতি আলী নাঈম, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি ও প্রগতিশীল ছাত্র জোটের সমন্বয়ক গোলাম মোস্তফা, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি ইকবাল কবীর প্রমুখ। *(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

'১৫ টাকায় থাকা আর ৩৮ টাকায় খাওয়া'? আবাসিক হল জীবনের গল্প

তরিকুল বাড়ি ছেড়ে উচ্চশিক্ষার জন্য ঢাকায় আসে ২০১৬ সালে। এখন সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় বর্ষের ছাত্র। দু'বছর ধরে সে গণরুমে গাদাগাদি করে থাকে। একদিক থেকে সে ভাগ্যবান। কারণ কেউ কেউ গণরুমেও আশ্রয় পায় না। তাদের কেউ থাকে খোলা বারান্দায়, কেউ বা মসজিদে। পড়ে কখনও লাইব্রেরি, কখনও হলের রিডিং রুমে, কখনও বিভাগের সেমিনার রুমে – আর কোথাও জায়গা না পেলে নিজের বিছানার উপর বসে বসে। কবে সিট পাবে তা সে জানে না। না পেলে তার করারও কিছু নেই। এই উপায়েই তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে টিকে থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ঘূর্ণিঝড়ের সময় খোলা সাময়িক আশ্রয়কেন্দ্র নয়। ছাত্ররা এখানে আশ্রয় চাইতে আসেনি। এখানে সিট পাওয়া তার অধিকার। কিন্তু ব্যাপারটা অবস্থাদৃষ্টে এখন একরকম আশ্রয়কেন্দ্র হয়েই দাঁড়িয়েছে।

দেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই অভিন্ন চিত্র। ৩৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাড়ে চার লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে আবাসন সুবিধা রয়েছে ৬৬ হাজার ১৪৯ জনের। অর্থাৎ শতকরা ৮৫ ভাগ শিক্ষার্থীরই কোন আবাসন সুবিধা নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর শতকরা প্রায় ৩৫ শতাংশের, বুয়েটের প্রায় ৩০ শতাংশের, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৪৮ শতাংশের, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ২২ শতাংশের আবাসনের ব্যবস্থা আছে। পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এই অবস্থা দেখে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা বুঝতে অসুবিধা হয় না। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের কোন আবাসন ব্যবস্থাই নেই। নতুন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোনটিরই আবাসন সুবিধা শতকরা ৩০ শতাংশের বেশি নয়।

একটা ঘুমাবার বিছানা ও একটা পড়ার টেবিল, মোটামুটি চলা যায় এমন একটা ঘর – এর বাইরে কোন বিলাসিতা আশা করে না দূর-দূরান্ত থেকে পড়তে আসা তরিকুলদের মতো ছাত্ররা। কিন্তু বাস্তব চিত্র খুবই করুণ। পত্রিকায় এ নিয়ে খবর এসেছে, ছবি এসেছে। হাজতিদের মতো হলের ডাইনিং, টিভি রুম, মসজিদে লাইন দিয়ে শুয়ে আছে ছাত্ররা। এই রুমগুলো পেলে ভাল, অনেক জায়গায় রুম না পেয়ে তাদের আশ্রয় নিতে হয় হলের বারান্দাতে। লাইন দিয়ে খোলা বারান্দাতে সারিবদ্ধভাবে শুয়ে আছে ছাত্ররা; সেখানে রোদ আসছে, বৃষ্টি আসছে, শীত আসছে – এই চিত্র তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী হলের। দুই সিঁড়ির সংযোগস্থলের ফাঁকা জায়গায় চেয়ার-টেবিল পেতে পড়তে বসেছে ছাত্ররা কিংবা বারান্দার কোণে পেতেছে চেয়ার-টেবিল – এ চিত্রও বিরল নয়। এই অবস্থার মধ্যে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের ১৫ টাকার সিটে থাকা আর ৩৮ টাকা খাবারের খোটা দিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের জীবন যাপন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য নির্মম রসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অমানবিক পরিস্থিতিতে হলে থাকার পরও একজন ছাত্রের মাসিক খরচ কত হতে পারে? গড়ে তাদের দুটো টিউশনি করতে হয়। কেউ কেউ তিনটা করেন, কেউ চারটা। কিন্তু ন্যূনতম প্রয়োজন কেউই মেটাতে পারেন না। বাস্তব অবস্থা হল খাবার বাবদ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র গড়ে খরচ করেন তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা, সারা মাসে মোট খরচ করেন গড়ে পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দারিদ্র্যসীমা পরিমাপের জন্য যে 'cost of basic needs (CBN)' পদ্ধতি ব্যবহার করে। সে অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ শতাংশ ছাত্রই দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করে। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় খাবার, জীবনধারণ ও লেখাপড়ার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সে জোগাড় করতে পারে না। ৮০ ভাগ ছাত্রই পারে না। তারা কোনরকমে চলে।

এই হচ্ছে হলে থাকা শিক্ষার্থীদের জীবনের বাস্তব চিত্র। একটি লেখায় এই সংকটের পুরোটা তুলে ধরা অসম্ভব। হলের খাবারের গুণগত মান নিয়ে এক দীর্ঘ আলোচনা হতে পারে। আলোচনা

মাদক নির্মূলের নামে র‍্যাব-পুলিশকে বিনা বিচারে হত্যার লাইসেন্স দিয়েছে সরকার

"মাদক নির্মূলের নামে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে বিনা বিচারে হত্যার লাইসেন্স তুলে দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার নির্বাচনের আগে একদিকে সস্তা জনপ্রিয়তা ও বাহবা কুড়াতে চায়, অন্যদিকে সমাজে আতংকের পরিবেশ সৃষ্টি করে সরকারবিরোধী আন্দোলন দমন করতে চায়। অথচ মাদক সাম্রাজ্যের গডফাদারদের ধরা হচ্ছে না, সরকারী দলে ও পুলিশ-প্রশাসনের মধ্যে মাদক বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষক-সুবিধাভোগীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। সকল বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড আইনের শাসন ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।" চলমান মাদকবিরোধী অভিযানে ক্রসফায়ারের নামে বিনা বিচারে হত্যা বন্ধ এবং মাদক ব্যবসার গডফাদারদের গ্রেপ্তার-বিচারের দাবিতে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে ৭ জুন বৃহস্পতিবার বিকেল সোয়া ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন। গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার সমন্বয়ক ও বাসদ(মার্কসবাদী) নেতা শুভ্রাংশু চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সাইফুল হক, মোশাররফ হোসেন নান্নু, মোশরেফা মিশু, ফিরোজ আহমেদ, হামিদুল হক প্রমুখ। সমাবেশের পর একটি বিক্ষোভ মিছিল রাজপথ প্রদক্ষিণ করে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, "দেশে দীর্ঘদিন ধরে মাদকব্যবসা বিস্তার লাভ করে মাদকদ্রব্য সহজলভ্য পণ্যে পরিণত হয়েছে এবং এক ভয়াবহ জাতীয় সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। যেকোনো বিবেকবান মানুষ মাদকবিরোধী অভিযান ও কঠোর পদক্ষেপকে স্বাগত জানায়। কিন্তু মাদক নির্মূলের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ বিচার পাওয়ার অধিকার এমনকি মাদক ব্যবসায়ীদেরও আছে। আদালতে প্রমাণ করা ছাড়া শুধু অভিযোগের ভিত্তিতে বা সন্দেহের বশে খুন করার অবাধ লাইসেন্স দেয়া হলে ভুলক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে যেকোন নির্দোষ মানুষ এর শিকার হতে পারেন। অপরাধ দমনের নামে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাকে খুনী বাহিনীতে পরিণত করা হলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা থাকে। এর মধ্য দিয়ে সরকার বিরোধীদের অপরাধী আখ্যা দিয়ে নির্বিচারে খুন করার ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে। এই সরকার এবং পূর্বের সরকারের নির্দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ক্রসফায়ার-গুম নাম দিয়ে অতীতে এই ধরণের বহু রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে অব্যাহত বিচারবহির্ভূত হত্যা ও গুম মহাজোট সরকারের ফ্যাসিবাদী চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ।"নেতৃবৃন্দ ক্রসফায়ার-এনকাউন্টারের নামে বেআইনী হত্যাকাণ্ডের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও গণতন্ত্রমনা মানুষের প্রতি আহ্বান জানান।

বাসদ (মার্কসবাদী) : কথিত মাদক *(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

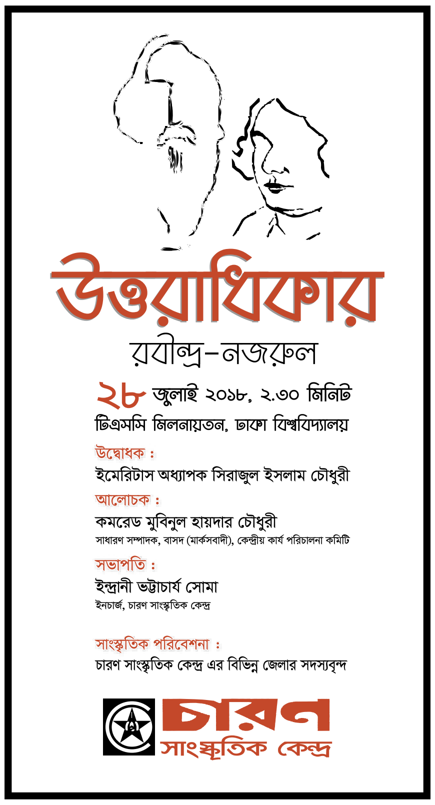

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org । ই-মেইল : mail@spbm.org